বামুনের মেয়ে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অ্যাসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[illegible], মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নূতন প্রথম সংস্করণ
চৈত্র, ১৮৮২ শকাব্দ

নূতন দ্বিতীয় সংস্করণ
ভাদ্র, ১৮৮৭ শকাব্দ

[illegible]কাদশ মুদ্রণ ঃ
[illegible]হায়ণ, ১৩৬৫

টা ২·৬০

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীননীমোহন সাহা,
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ,
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

সবিস্তারে আহরণ করিতে তিনি কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বটে! বলি, কবে তাড়িয়ে দিলে লো?

পরশু আশ্বিরে মাঠান্।

ও—তুই এককড়ে দুলের মেয়ে বুঝি! তাই বল! এককড়ে মরতে-না-মরতে বুড়ো তোদের বের করে দিলে? ছোটজাতের মুখে আগুন! তা বাপু, দিলে বলেই কি তোরা বামুন-পাড়ায় এসে থাকবি? তোদের আস্পদ্দা ত কম নয় লা? কে আনলে তোর মাকে? রামতনু বাড়ুয্যের জামাই বুঝি? নইলে এমন বিদ্যে আর কার! ঘর-জামাই ঘর-জামাইয়ের মত থাক্, তা না, শ্বশুরের বিষয় পেয়েচিস্ বলে পাড়ার মধ্যে হাড়ি-ডোম-দুলে-ক্যাওড়া এনে বসাবি?

এই বলিয়া রাসমণি হাঁক দিয়া ডাকিলেন, বলি, সন্ধ্যা!—ও সন্ধ্যা! ঘরে আছিস্ গা?

সামান্য একটুখানি পোড়ো-জমির ও-ধারে রামতনু বাড়ুয্যের খিড়কী। তাঁহার ডাক শুনিয়া অদূরবর্ত্তী খিড়কীর দ্বার খুলিয়া একটি উনিশ বছরের সুশ্রী মেয়ে মুখ বাহির করিয়া সাড়া দিল—কে ডাক গা? ওমা, দিদিমা যে! কেন গা? বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া আসিল।

রাসমণি কহিলেন, তোর বাপের আক্কেলটা কি-রকম শুনি বাছা? তোর দাদামশাই রামতনু বাড়ুয্যে—একটা ডাকসাইটে কুলীন, তার ভিটে-বাড়ীতে আজ প্রজা বসল কি-না বাগ্দী-দুলে! কি ঘেন্নার কথা মা!

এই বলিয়া গালে একবার হাত দিয়াই পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, তোর মাকে একবার ডাক্। জগো এর কি বিহিত করে করুক, নইলে চাটুয্যেদাদাকে গিয়ে আমি নিজে জানিয়ে আসব। সে ত একটা জমিদার! একটা নামজাদা বড়লোক! সে কি বলে একবার শুনি।

সন্ধ্যা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে দিদিমা ?

ডাক্ না তোর মাকে ! তাকে বলে যাচ্ছি কি হয়েচে।

এই বলিয়া নাতিনীকে দেখাইয়া কহিলেন, এই যে মেয়েটা মঙ্গল-বারের বারবেলায় ছাগল-দড়ি ডিঙিয়ে ফেললে, ওই যে দুলে-ছুঁড়ি আঁচল ঘুরিয়ে বাছাকে ছুঁয়ে দিলে—

সন্ধ্যা দুলে-মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই ছুঁয়ে ফেলেচিস্ ?

সে-বেচারা তখনও ছাগ-শিশু বুকে করিয়া একধারে দাঁড়াইয়াছিল, কাঁদো-কাঁদো গলায় অস্বীকার করিয়া বলিল, না, দিদিঠান্—

রাসমণির নাতিনীটিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, না সন্ধ্যা-দিদি, ও আমাকে ছোঁয়নি, ওই হোথা দিয়ে—

কিন্তু কথাটা তাহার পিতামহীর হুঙ্কারে ওই পর্য্যন্তই হইয়া রহিল।

ফের 'নেই' কচ্ছিস্ হারামজাদী। চল, আগে বাড়ী চল্। ছুঁয়েচে কি না সেখানে গিয়ে দেখাচ্ছি।

সন্ধ্যা হাসিয়া কহিল, জোর করে নাওয়ালে ও আর কি করবে দিদিমা।

তাহার হাসিতে রাসমণি জ্বলিয়া গেলেন। বলিলেন, জোর করি, না করি, সে আমি বুঝবো, কিন্তু তোর বাপের ব্যাভারটা কি-রকম ? কোন্ ভদ্দরলোকটা ভিটে-বাড়ীতে ছোট-জাত ঢোকায় শুনি ? লোকে কথায় বলে, দুলে ! সেই দুলে এনে বামুনপাড়ায় ঢুকিয়েচে ! বলি, ঘর-জামাই ঘর-জামাইয়ের মত থাকলেই ত ভাল হয়।

পিতার সম্বন্ধে এই অপমানকর উক্তিতে ক্রোধে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; সেও কঠিন হইয়া জবাব দিল, বাবা ত আর পরের ভিটেয় ছোট-জাত ঢোকাতে যাননি দিদিমা। ভাল বুঝেচেন নিজের

জায়গায় আশ্রয় দিয়েচেন, তাতে তোমারই বা এত গায়ের জ্বালা কেন?

আমার গায়ের জ্বালা কেন! কেন জ্বালা দেখবি তবে! যাবো একবার চাটুয্যেদাদার কাছে? গিয়ে বলব?

তা বেশ ত, গিয়ে বল গে না। বাবা ত তাঁর জায়গায় তুলে বসান-নি যে, তিনি বড়লোক বলে বাবার মাথাটা কেটে নেবেন!

বটে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ওলো, সে আর কেউ নয়—গোলক চাটুয্যে! তোর বাপ বুঝি এখনো তারে চেনেনি? আচ্ছা—

হাঙ্গামা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই রাসমণি অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন; চীৎকারে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া বলিলেন, শোন জগো, তোর বিদ্যেধরী মেয়ের আস্পর্দ্ধার কথাটা একবার শোন্। লেখাপড়া শেখাচ্ছিস্ কি না! বলে, বলিস্ তোর গোলক চাটুয্যেকে বাবার মাথাটা যেন কেটে নেয়! বলে, বেশ করেচি নিজের জায়গায় ভিটে তুলে বসিয়েচি—কারো বাপ-ঠাকুর্দ্দার জায়গায় বসাইনি—অমন ঢের বড়লোক দেখেচি, যে যা পাবে তা করুক। শোন্ তোর মেয়ের কথাগুলো একবার শোন্!

জগদ্ধাত্রী বিস্মিত ও কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলেচিস্ এই-সব কথা?

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি এমন করে বলিনি।

রাসমণি তাহারই মুখের উপর হাত নাড়িয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—বললিনে? এরা সবাই সাক্ষী নেই?

কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর অনির্ব্বচনীয় কৌশলে উচ্চ-সপ্তক হইতে একেবারে খাদের নিখাদে নামাইয়া লইয়া জগদ্ধাত্রীকে সম্বোধন

করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা, ভাল কথাই বলেছিলুম। মঙ্গলবারের বারবেলায় মেয়েটা ছাগল-দড়ি ডিঙিয়ে ফেললে, তাই বললুম, আহা, কে এমন করে পথের ওপর ছাগল বাঁধলে গা? তাই না শুনতে পেয়ে দুলে-ছুঁড়িটা ছুটে এসে বাছার মুখের ওপর আঁচল ঘুরিয়ে মারলে! বলে, ঠাকুরমশায়ের জায়গায় ছাগল বেঁধেচি, তুমি বলবার কে? তাই মা, তোমার মেয়েকে ডেকে শুধু এই কথাটি বলেচি, দিদি, এই যে অ-বেলায় মেয়েটার নাইতে হবে, বারবেলায় ছাগল-দড়ি ডিঙিয়ে ফেললে—তা তোমার বাবা যদি এদের দুলে-পাড়া থেকে তুলে এনে বসিয়েই থাকে ত দিদি, ছাগল-টাগলগুলো একটু দেখে-শুনে বাঁধতে বলে দিস্—ছোট-জেতের আচার-বিচারের জ্ঞানগম্যি ত এই—নইলে চাটুয্যেদাদা, বুড়োমানুষ, এই পথেই ত আসা-যাওয়া করে—মাড়া-মাড়ি করে আবার রেগে-টেগে উঠবে—মা, এই! এতেই তোমার মেয়ে আমায় মারতে যা বাকি রেখেচে। বলে, যা যা, তোর চাটুয্যেদাদাকে ডেকে আন্ গে। তার মত বড়লোক আমি ঢের দেখেচি। তার বাপের জায়গায় যখন হাড়ি-দুলে প্রজা বসাবো, তখন যেন সে শাসন করতে আসে। আচ্ছা, তুমিই বল দিকি মা, এইগুলো কি মেয়ের কথা?

জগদ্ধাত্রী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন, বলেচিস্ এই-সব?

সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে রাসমণির মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, মায়ের কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া শুধু বলিল, না।

বলিস্নি, তবে কি মাসি মিছে কথা কইচে?

বল্ মা, তাই একবার তোর মেয়েকে বল্!

সন্ধ্যা মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, জানিনে মা, কার কথা মিছে; কিন্তু তোমার আপনার মেয়ের চেয়ে এই পাতানো-মাসিকেই যদি বেশি চিনে থাকো ত না হয় তাই।

এই বলিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের পূর্ব্বেই খোলা দ্বার দিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল। উভয়েই বিস্ফারিত-নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অবসর বুঝিয়া দুলে-মেয়েটাও তাহার ছাগল-ছানা বুকে করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

রাসমণি বলিলেন, দেখলি ত জগো, তোর মেয়ের তেজ! শুনলি ত কথা! বলে পাতানো মাসি! কুলীনের ঘরের মেয়ে, তাই। নইলে, বিয়ে হলে এ বয়সে যে পাঁচ-ছ ছেলের মা হতে পারত। পাতানো মাসি—শুনলি ত!

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিলেন এবং রাসমণি নিজেও একটু স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, হাঁ জগো, শুনলুম নাকি অমর্ত্ত চক্কোত্তির ছেলেটাকে তোরা আজও বাড়ীতে ঢুকতে দিস্? বলি, কথাটা কি সত্যি?

জগদ্ধাত্রী মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

রাসমণি বলিতে লাগিলেন, আমি ত সেদিন পুলিনের মায়ের সঙ্গে ঝগড়াই করে ফেললুম। বললুম, সে মেয়ে জগদ্ধাত্রী—আর কেউ নয়। হরিহর বাড়ুয্যেমশায়ের নাতনী রামতনু বাড়ুয্যের কন্যা। যারা শূদ্দুর বলে কায়েতের বাড়ীতে পর্য্যন্ত পা ধোয় না। তারা দেবে ঐ মেলেচ্ছ ছোঁড়াটাকে উঠোন মাড়াতে! তোরা বলচিস্ কি?

এই হিতৈষিণীর দরদের কাছে লজ্জা পাইয়া জগদ্ধাত্রী শুধু একটু-খানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, কথাটা তুমি ঠিকই বলেচ মাসি, তবে কি জানো মা, ছেলেবেলা থেকেই ওর আসা-যাওয়া আছে, আমাকে খুড়ীমা বলতে অজ্ঞান, তাই কালে-ভদ্রে কখনো আসে ত মুখ-ফুটে বলতে পারিনে, অরুণ তুমি আর আমার বাড়ীর মধ্যে ঢুকো না। মা-বাপ নেই, বাছাকে দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়।

রাসমণি প্রথমে অবাক্ হইলেন, পরে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, অমন মায়ার মুখে আগুন!

অকস্মাৎ সেই ক্রোধ অতি উচ্চ ধাপে চড়িয়া গেল এবং তাহারই সহিত কণ্ঠস্বরে সমতা রক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই একগুঁয়ে ছোঁড়াটাকে কি তোরা সোজা বজ্জাত ঠাওরাস? অমন নচ্ছার গাঁয়ের মধ্যে আর দুটি নেই, তোকে বলে দিলুম। চাটুয্যেদাদা, একটা জমিদার মানুষ—তিনি নিজে স্বয়ং ছোঁড়াটাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, অরুণ, জলপানির লোভ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ব'সো গে যাও; বিলেত যেয়ো না। কিন্তু কথাটা কি ছোঁড়া শুনলে? অতবড় একটা মানী লোকের মান রাখলে? উল্টে ছোঁড়া নাকি বিলেত যাবার সময় ঠাট্টা করে বলেছিল, বিলেত গিয়ে জাত যায় আমার সেও ভাল, কিন্তু গোলক চাটুয্যের মত বিলেতে পাঁটা-ভেড়া চালান দিয়ে টাকা করতেও চাইনে; সমাজের মাথায় চড়ে লোকের জাত মেরে বেড়াতেও পারব না। উঃ—আমি যদি সেখানে থাকতুম জগো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ সোজা করে দিতুম। যে গোলক চাটুয্যে—ভাত খেয়ে গোবর দিয়ে মুখ ধোয়, তাকে কি না—

জগদ্ধাত্রী বিনীত-কণ্ঠে বলিতে গেলেন, কিন্তু অরুণ ত কখনো কারও নিন্দে করে না মাসি?

তবে বুঝি আমি মিছে কথা কইচি! চাটুয্যেদাদা বুঝি তবে—

না না, তিনি বলবেন কেন! তবে, লোকে নাকি অনেক কথা বানিয়ে বলে—

তোর এক কথা জগো! লোকের ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই গেছে বানিয়ে বলতে। আচ্ছা, তাই-বা বিলেতে গিয়ে কোন্ দিগ্‌গজ হয়ে এলি? শিখে এলি চাষার বিদ্যে! শুনে হেসে

বাঁচিনে! চক্কোত্তিই হ, আর যাই হ, বামুনের ছেলে ত বটে! দেশে কি চাষী ছিল না? এখন তুই কি যাবি হাল-গরু নিয়ে মাঠে মাঠে লাঙ্গল দিতে! মরণ আর কি!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীব্র সৌরভ ক্রমে ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, গন্ধ পাইয়া পাছে পাড়ার সমজদার মধুমক্ষীর দল জুটিয়া যায়, এই ভয়ে জগদ্ধাত্রী আস্তে আস্তে বলিলেন, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন মাসি, একটু ভেতরে গিয়ে বসবে চল না?

না মা, বেলা গেল, আর বসব না। মেয়েটাকেও ত আবার নাইয়ে-ধুইয়ে ঘরে তুলতে হবে। দুলে-ছুঁড়িটা বুঝি পালিয়েচে?

হাঁ ঠাকুমা, তোমরা যখন কথা কচ্ছিলে; কিন্তু সে আমাকে ছোঁয়নি—

ফের 'নেই' কচ্ছিস হারামজাদী! কিন্তু জগো, ব্যাগত্তা করি বাছা, পাড়ার ভেতর আর হাড়ি-দুলে ঢোকাস্‌নি। জামাইকেও বলিস্‌।

বলব বই-কি মাসি, আমি কালই ওদের দূর করে দেবো। আর থাকলে ত আমাদেরই পুকুর-ঘাট সরবে, ওদের স্কন্ধ মাড়া মাড়ি করে আমাদেরই ত হাঁটতে হবে।

তবে, তাই বল্ না মা। তা হলে কি আর জাত-জন্ম থাকবে? আমি ত সেই কথাই বলছিলুম, কিন্তু আজকালকার মেয়েছেলেরা নাকি কিছু মানতে চায়? তাই ত চাটুয্যেদাদা সেদিন শুনে অবাক্ হয়ে বললেন, রাসু, আমাদের জগদ্ধাত্রীর মেয়েটাকে নাকি তার বাপ লেখাপড়া শিখুচ্চে? তারা করচে কি! মানা করে দে—মানা করে দে—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে!

জগদ্ধাত্রীর ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কহিলেন, চাটুয্যেমামা বুঝি বলছিলেন?

বলবে না? সে হ'লো সমাজের মাথা, গাঁয়ের একটা জমিদার।

তার কানে আর কোন্ কথাটা না ওঠে বল্? এই ত আমারও—ধর্ না কেন, বুড়ো হতে চললুম—লেখাপড়ার ত ধার ধারিনে, কিন্তু কোন্ শাস্তরটি না জানি বল্? কারও বাপের সাধ্যি আছে বলে, রাসি বামনি একটা অশাস্তর কাজ করেচে? এই যে মেয়েটা ছাগল-দড়ি ডিঙোবা-মাত্তর শিউরে উঠে বললুম, ওলো ছুঁড়ি, করলি কি, আজ যে মঙ্গলবারের বারবেলা! কই কোন্ পণ্ডিত বলে যাক দিকি—না, এতে দোষ নেই! তা হবার যো নেই মা, তা হবার যো নেই। আমরা বাপ-মায়ের কাছে শিক্ষে পেয়েছিলুম। কিন্তু ডাকো দিকি তোমার লিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েকে কেমন বলতে পারে?

জগদ্ধাত্রী নিঃশব্দে ত্রুটি স্বীকার করিয়া কহিলেন, একটু বসলে হ'তো না মাসি?

না মা, বেলা গেছে—আর একদিন আসব। না খেঁদি, বাড়ী চল্। এই বলিয়া নাতিনীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কয়েকপদ চলিয়া, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ জগো, অমন পাত্তরটি হাত-ছাড়া করলি কেন বল্ দেখি?

না, হাত-ছাড়া ঠিক নয়, তবে কি-না ঘর-বাড়ী কিছু নেই, বয়েস হয়েচে—তোমার জামাইয়ের মত হয় না, বাছা।

রাসমণি বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, শোন কথা একবার! বলি, তার ঘর নেই, তোর ত আছে? তোর আর ছেলেও নেই, মেয়েও নেই যে তার জন্যে ভাবনা! এক মেয়ে, সেই মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর করতিস্, সে কি অমন্দ হ'তো বাছা? আর বয়েস? কুলীনের ছেলের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়েস কি আবার একটা বয়েস? রসিকপুরের জয়রাম মুখুয্যের দৌউত্তর! তার আবার বয়সের খোঁজ কে করে, জগো? তা ছাড়া মেয়ের বয়সের দিকেও

একবার ডাকা দিকিনি! আরও গড়িমসি করবি ত বিয়ে দিবি কবে? শেষে কি তোর ছোটপিসির মত চিরটা কাল থুবড়ো রাখবি?

জগদ্ধাত্রী সলজ্জভাবে কহিলেন, আমিও ত তাই বলি মাসি, কিন্তু মেয়ের বাপ যে একেবারে—

কথাটাকে সম্পূর্ণ করিতে দিবার ধৈর্য্যও রাসমণির রহিল না। জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, মেয়ের বাপ বলবে না কেন? আহা! তাঁর নিজেরই যেন কত ঘর-বাড়ী জমিদারী ছিল! হাসালি বাপু তোরা! তা ছাড়া, ঐ অরুণদের বৈঠকে দিন-রাত বসা-দাঁড়ানো, গান-বাজনা করা—শুনি হুঁকো পর্য্যন্ত নাকি চলে যাচ্ছে—ও-কথা সে বলবে না ত কি চাটুয্যেদাদা বলবে? হদ্দ করলি জগো! কিন্তু তোকে বলে দিচ্ছি বাছা, ঘর-বর যখন মিলেচে, তখন না না করে দেরী করে শেষকালে অতি-লোভে তাঁতি নষ্ট করিস্‌নে। তোর ছোটপিসি গোলাপী থুবড়ো হয়ে ম'লো, তোর বাপের বড় মেজ দুই পিসির বিয়েই হ'লো না। আর তোরই কি সময়ে বিয়ে হ'তো বাছা, যদি না তোর বাপ-মা কাশীতে গিয়ে পড়ত? বেয়ান কাশীবাসিনী, কামড়-কোমড় নেই, জামাই ইস্কুলে পড়চে—ঘর-বর যাই মিলে গেল, অমনি ধাঁ করে তোদের দু'হাত এক করে দিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে দেশের লোক দেশে ফিরে এলো। ভাংচির ভয়ে বিয়ের আগে কাউকে খবরটুকু পর্য্যন্ত দিলে না। তা ভালই করেছিল, নইলে বিয়ে হ'তোই কি-না তাই-বা কে জানে! নে খেঁদি চল্! জয়রাম মুখুয্যের নাতি, তার আবার ঘর-বাড়ী, তার আবার বয়স, তার আবার কালো-ধলো —কালে কালে কতই শুনব! নে, এগো বাছা, আর দেরী করিস্‌নে। কাপড়-চোপড় কাচতে, সন্ধ্যা দিয়ে আহ্নিক-মালা সারতে আজ দেখচি একপ্রহর রাত হয়ে যাবে। কিন্তু তাও বলি বাপু, খিষ্টেন-ফিষ্টেনকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়া, মেয়ের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে

দেওয়া ভাল নয়। কথাটা টি টি হয়ে গেলে মেয়ের পাত্তর পাওয়া ভার হবে বাছা! নে না খেঁদি, চল্ না! পরের কথা পেলে তুই যে আর নড়তে চাস্‌নে দেখি।

বকিতে বকিতে নাতিনীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রাসমণি প্রস্থান করিতেছিলেন, জগদ্ধাত্রী শঙ্কিত বিরস-মুখে কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল কহিলেন, ওমা খেঁদি, একটু দাঁড়া দিকি বাছা। ক্ষেত থেকে কাল একঝুড়ি নতুন মুক্তকেশী বেগুন, আর একটা কচি নাউ এসেছিল, তার গোটা-কতক আর নাউয়ের একফালি সঙ্গে নিয়ে যা দিকি মা—আমি চট করে পেড়ে দিই।

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাটীর দিকে যাইতেছিলেন, রাসমণি পুলকিত-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ওমা, বেগুন বুঝি এরি মধ্যে উঠলো? বলিয়াই কণ্ঠস্বর একমুহূর্ত্তে খাটো করিয়া নাতিনীকে কহিলেন, ওলো খেঁদি, মুখপোড়া মেয়ে! ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে রইলি, সঙ্গে সঙ্গে যা না! এবং পরক্ষণেই তাহাকে পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন, ছুটে আসিস্, খেঁদি—আমি ততক্ষণ একটু এগোই।

[খ]

সম্মুখের একটা দাওয়ায় বসিয়া সন্ধ্যা নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, জগদ্ধাত্রী আহ্নিক সারিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষণকাল কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকাল থেকে কি অত সেলাই হচ্ছে সন্ধ্যে, বেলা যে দুপুর বেজে

গেছে—নাওয়া-খাওয়া করবিনে? পরশু সবে পথ্যি করেচিস্, আবার কিন্তু পিত্তি পড়ে অসুখ হবে তা বলে দিচ্ছি।

সন্ধ্যা দাঁত দিয়া বাড়তি সূতাটা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, বাবা যে এখনো আসেননি মা।

তা জানি। কেবল বিনি-পয়সার চিকিচ্ছে সারতে কত বেলা হবে সেইটে জানিনে। আর বেশ ত, আমি ত আছি, তোর উপোস করে থাকবার দরকারটা কি?

সন্ধ্যা নীরবে কাজ করিতে লাগিল, জবাব দিল না।

মা প্রশ্ন করিলেন, সেলাইটা কিসের হচ্ছে শুনি?

মেয়ে অনিচ্ছুক অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, এই দুটো বোতাম পরিয়ে দিচ্ছি।

তা জানি মা, জানি। নইলে আমার কাপড়খানা সেরে রাখতে বসেচিস্ কি না, তা জিজ্ঞেস করিনি; কিন্তু কি বাপ-সোহাগীই হয়েচিস্ সন্ধ্যে, যেন পৃথিবীতে ও আর কারও নেই। কোথায় একটা বোতাম নেই, কোথায় কাপড়ের কোণে একটু খোচা লেগেচে, কোন্ পিরানটায় একটু দাগ ধরেচে, জুতো-জোড়াটার কোথায় এক-রত্তি সেলাই কেটেচে—এই নিয়েই দিবারাত্তির আছিস্, এ-ছাড়া সংসারে আর যেন কোন কাজ নেই তোর।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, বাবার যে কিছু নজরে পড়ে না মা।

জবাব শুনিয়া মা খুসি হইলেন না, বলিলেন, পড়বে কি করে,—বিনি-পয়সার ডাক্তারিতে সময় পেলে ত! বলি, দুলে-মাগীরা গেল?

যাবে বই কি মা।

কিন্তু সে কবে? ছোঁয়া-ন্যাপা করে জাত-জন্ম ঘুচে গেলে, তার পরে? আবার যে বড় ছুঁচে সূতা পরাচ্ছিস্? উঠবিনে বুঝি?

তুমি যাও না মা, আমি এখুনি যাচ্ছি।

এই অসুখ-শরীরে যা ইচ্ছে তুমি কর গে মা—তোমাদের দু'জনের সঙ্গে বকতে বকতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল; সংসারে আর আমার দরকার নেই—এইবার আমি শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কাশীবাস করব—তা কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি।

এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ক্রোধভরে একটা পিতলের কলসী তুলিয়া লইয়া খিড়কীর পুকুরের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা আনত-মুখে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, জননীর কোন কথার উত্তর দিল না। তাহার সেলাই প্রায় শেষ হইয়াছিল, ছুঁচ-সূতা প্রভৃতি এখনকার মত একটা ছোট সাবানের বাক্সে গুছাইয়া রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহার পিতার সোরগোলে চমকিয়া মুখ তুলিল। তিনি সদাই ব্যস্ত—এইমাত্র বাড়ী ঢুকিয়াছেন; হাতে একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধের ছোট বাক্স এবং বগলে চাপা কয়েকখানা ডাক্তারি বই। মেয়েকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, সন্ধ্যে ওঠ্‌ত মা, চট্ করে আমার বড় ওষুধের বাক্সটা একবার,—কি যে করি কিছুই ভেবে পাইনে—এমনি মুস্কিলের মধ্যে—

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতার হাতের বাক্স ও বইগুলা লইয়া একধারে রাখিয়া দিল। বারান্দায় ইতিপূর্ব্বে যে মাদুরখানি পাতিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই উপর হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল, আজ কেন তোমার এত দেরী হ'লো বাবা?

দেরী! আমার কি নাবার-খাবার ফুরসৎ আছে তোরা ভাবিস্? যে রুগীটির কাছে না যাবো তারই রাগ, তারই অভিমান। প্রিয় মুখুয্যের হাতের এককোঁটা ওষুধ না পেলে যেন আর কেউ বাঁচবে না। ভয় যে নেহাৎ মিথ্যে তা যদিও বলতে পারিনে, কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে ত একটাই—দুটো ত নয়! তাদের বলি—এই নন্দ মিস্তির

লোকটা যা হোক একটু প্র্যাক্টিস্ ত করচে—দু-একটা ওষুধ ও যে না জানে তা নয়—কিন্তু তা হবে না। মুখুয্যেমশাইকে নইলে চলবে না। আর তাদের বা কি বলি। একটা ওষুধের সিম্‌টম্ যদি মুখস্থ করবে! আরে অত সহজ বিদ্যে নয়—এত সহজ নয়! তা হলে সবাই ডাক্তার হ'তো! সবাই প্রিয় মুখুয্যে হ'তো!

বাবা, জামাটা ছেড়ে ফেলো না—

ছাড়চি মা। এই আজই—ধাঁ করে যে পল্‌সেটিলা দিয়ে ফেললি, প্র্যাক্‌টিস ত কচ্ছিস্, কিন্তু বল্ দিকি তার অ্যাক্‌শন? দেখি, আমার মত কেমন তুই কণ্ঠস্থ বলে যেতে পারিস্! সন্ধ্যে, ধর্ দিকি মা বই-খানা, একবার পল্‌সেটিলাটা—

তোমার আবার বই কি হবে বাবা? আজ খাওয়া দাওয়ার পরে ওই ওষুধটাই তোমার কাছে পড়ে নেবো। দেবে পড়িয়ে বাবা?

দেবো বই কি মা—দেবো বই কি। নক্সের সঙ্গে তফাৎটা হচ্চে আসলে—ওই বইখানা একবার—

তোমার পায়ে ততক্ষণ তেলটুকু মাখিয়ে দিই না বাবা? বড্ড বেলা হয়ে গেছে—মা আবার রাগ করবেন। বলিয়া সে একবার উদ্বিগ্ন-নেত্রে দেখিয়া লইল তাহার জননী ঘাট হইতে ফিরিতেছেন কি-না এবং আপত্তি করিবার পূর্ব্বেই তেলের বাটি হইতে খানিকটা তেল লইয়া বাবার পায়ে মাখাইয়া দিল।

ইঃ—একটু সবুর করলিনে মা। একবার দেখে নিয়ে—

আজ কাকে কাকে দেখলে বাবা? আচ্ছা, পঞ্চা জেলের ঠাকুর্দ্দাদা—

সে বুড়ো? ব্যাটা মরবে, মরবে, তুই দেখে নিস সন্ধ্যে। আর ঐ পরাণে চাটুয্যে—ও হারামজাদার নামে আমি কেস্ করে তবে ছাড়বো। যে রুগীটি পাবো, অমনি তাকে গিয়ে ভাঙচি দিয়ে

আসবে! একদিনের বেশি যে কেউ আমার ওষুধ খেতে চায় না, সে কেন? সে কেবল ওই নচ্ছার বোম্বেটে পাজী উল্লুকের জন্যে। কি করেচে জানিস্? পঞ্চার ঠাকুর্দ্দাকে যাই একটি রেমিডি সিলেক্ট করে দিয়ে এসেচি, অমনি ব্যাটা পিছনে পিছনে গিয়ে বলেচে, কই দেখি কি দিলে?

সন্ধ্যা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, তার পরে?

তাহার পিতা ততোধিক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, ব্যাটা বজ্জাত, ঢক্ ঢক্ করে সমস্ত শিশিটা খেয়ে ফেলে বলেচে, ছাই ওষুধ! এই ত সমস্ত খেয়ে ফেললুম। কই, আমার ওষুধ সে খাক্ ত দেখি! এই না বলে একশিশি ক্যাষ্টর অয়েল দিয়ে এসেচে! তারা বলে, ঠাকুর, তোমার ওষুধ সে এক-চুমুকে খেয়ে ফেললে, তার ওষুধ তুমি খেতে পারো ত তোমার ওষুধ আমরা খাবো, নইলে না।

সন্ধ্যা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিল, সে ত তুমি খাওনি বাবা?

নাঃ—তা কি আর খাই! কিন্তু এতটা বেলা পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ালুম, একটা রুগী জোগাড় করতে পারলুম না। পরাণের নামে আমি নিশ্চয় কেস্ করব তোকে বললুম সন্ধ্যে।

ক্ষোভে অভিমানে সন্ধ্যার চোখে জল আসিতে চাহিল। এই পিতাটিকে সংসারে সর্ব্বপ্রকার আঘাত, উপদ্রব, লাঞ্ছনা, উপহাস-পরিহাস হইতে বাঁচাইবার জন্য সে যেন অহরহ তাহার দশ-হাত বাড়াইয়া আড়াল করিয়া রাখিত। সজলকণ্ঠে কহিল, কেন বাবা তুমি পরের জন্যে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াবে! এই বাড়ীতেই যে কতজন তোমার ওষুধের জন্য এসে এসে ফিরে গেল।

কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। পল্লীর গরীব-দুঃখীরা ঔষধ চাহিতে আসে বটে, কিন্তু সে সন্ধ্যার কাছে, তাহার পিতার কাছে নয়। বাবার কাছেই সে ছোট-খাটো রোগের

চিকিৎসা করিতে শিখিয়াছিল এবং তাহার দেওয়া ঔষধ প্রায় নিষ্ফলও হইত না। কিন্তু গুরুটিকে রোগীরা যমের মত ভয় করিত। তাই তাহারা সতর্ক হইয়া খোঁজ-খবর লইয়া এমন সময় বাড়ী ঢুকিত, যেন হঠাৎ মুখুয্যেমশায়ের হাতের মধ্যে গিয়া না পড়িতে হয়। সন্ধ্যা ইহা জানিত, কিন্তু বাবার জন্য মিথ্যা বলিতে তাহার বাধিত না।

কিন্তু পিতা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—ফিরে গেল? কে কে? কারা কারা? কতক্ষণ গেল? কোন্ পথে গেল? নাম-ধাম জেনে নিয়েচিস্ ত?

সন্ধ্যা মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া কহিল, নাম-ধামে আমাদের কি দরকার বাবা, তারা আপনিই আবার আসবে অখন।

আঃ, তোদের জ্বালায় আর পারিনে বাপু। নামটা জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল? এখুনি ত একবার ঘুরে আসতে পারতুম। দেরীতে কঠিন দাঁড়াতে পারে—কিছুই বলা যায় না, —এখন একটি ফোঁটায় যে সারিয়ে দিতুম!

সন্ধ্যা নীরবে তেল মাখাইতে লাগিল, কিছুই বলিল না।

পিতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, কখন আসবে বলে গেল?

বিকেলবেলায় হয়ত—

হয়ত! দেখ্ দিকি কি রকম অন্যায়টাই হয়ে গেল! ধর, যদি কোনগতিকে নাই আসতে পারে? ওরে—ও সন্ধ্যে, বিপ্‌নের কাছে গিয়ে পড়ল না ত? পরাণে হারামজাদা ত ঐ খোঁজেই থাকে, সে ও এর মধ্যে খবর পায়নি? না বাপু, আর পারিনে আমি। বাড়ীতে কি ছাই দুটি মুড়ি-মুড়কিও ছিল না? দুটো দুটো দিয়ে কি ঘণ্টা-খানেক বসিয়ে রাখতে পারতিস্‌নে? যা না বলে দেবো, যেটি না

দেখব—কে? কে? কে উঁকি মারচ হে? চলে এসো না? না, সে আরে রামময় যে? খোঁড়াচ্ছো কেন বল দিকি? কি

তাঁহার সাদর আহ্বানে ও কলকণ্ঠে একজন চাষি-গোছের মধ্য-বয়সী লোক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একান্ত নিস্পৃহ-স্বরে কহিল, আজ্ঞে না, ও কিছু না—

কিছু না? বিলক্ষণ! দিব্যি খোঁড়াচ্ছো যে! আঃ—তেল মাখানোটা একটু রাখ্‌ না সন্ধ্যে! কিছু না? স্পষ্ট আরনিকা কেস্‌ দেখতে পাচ্ছি—না না, তামাসা নয় রামময়, কৈ দেখি পা-টা?

পা দেখানোর প্রস্তাবে রামময় একটিবার করুণ-চক্ষে সন্ধ্যার মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, এই পা-টা একটু মুচকে কাল পড়ে গিয়েছিলুম।

প্রিয়বাবু কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, দেখলি ত সন্ধ্যে, দেখেই বলেচি কি না আরনিকা! আমরা দেখলেই যে বুঝতে পারি! হুঁ, পড়লে কি করে?

আজ্ঞে, ঐ যে বললুম, পা মুচড়ে। দরজার পাশেই একটা জল যাবার ছোট নর্দ্দমার ওপর থেকে ছেলেগুলো তক্তাখানা সরিয়ে ফেলেছিল, অন্যমনস্ক হয়ে—

অন্যমনস্ক? এ্যাগ্‌নস্‌—এপিস্‌?—সন্ধ্যে, মা, মনে রাখবে স্বভাবটাই আসল জিনিস। মহাত্মা হেরিং বলেচেন—হুঁ, অন্যমনস্ক হয়ে—তার পর?

যাই পা বাড়াবো অমনি হুমড়ে পড়ে—

থামো, থামো। এই যে বললে মুচড়ে? মোচড়ানো আর দোমড়ানো এক নয় রাম।

আজ্ঞে, না। তা ঐ পা মুচড়েই পড়ে গেলুম বটে।

হুঁ—অন্যমনস্ক! মনে থাকে না! এই বলে, এই ভোলে। এ্যাগ্নস্! এপিস্! হুঁ—তার পরে?

তার পর আর কি ঠাকুরমশাই, কাল থেকেই বেদনায় পা ফেলতে পারচিনে।

এই বলিয়া লোকটা উৎসুক-চক্ষে একবার সন্ধ্যার মুখের প্রতি চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিল।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি কহিল, বেলা হয়ে যাচ্ছে, একটু আরনিকা—

আঃ—থাম্ না সন্ধ্যে। কেস্টা ষ্টাডি করতে দে না। সিমিলিয়া সিমিলিবস্! রেমিডি সিলেক্ট করা ত ছেলেখেলা নয়! বদনাম হয়ে যাবে। হুঁ, তার পরে? বেদনাটা কি-রকম বল দেখি রামময়?

আজ্ঞে, বড্ড বেদনা ঠাকুরমশাই।

আহা তা নয়, তা নয়। কি-রকমের বেদনা? ঘর্ষণবৎ না মর্ষণবৎ? সূচীবিদ্ধবৎ না বৃশ্চিক-দংশনবৎ কন্ কন করচে, না ঝন্ ঝন্ করচে?

আজ্ঞে হাঁ, ঠাকুরমশাই, ঠিক ওই-রকম করচে।

তা হলে ঝন্ ঝন্ করচে। ঠিক তাই। তার পরে?

তার পরে আর কি হবে ঠাকুরমশাই, কাল থেকে ব্যথায় মরে যাচ্ছি—

থামো, থামো! কি বললে? মরে যাচ্ছো?

রামময় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, তা বই কি মুখুয্যে-মশাই। খুঁড়িয়ে চলচি, পা ফেলতে পারিনে—আর মরা নয় ত কি! তা ছাড়া, ছোঁড়াগুলো যে বজ্জাত—কথা শোনে না, বারণ মানে না—ওই তক্তাখানা নিয়েই তাদের যত খেলা। আবার কোন-দিন হয়ত আঁধারে পড়ে মরবো দেখতে পাচ্ছি। যা হয় একটু ওষুধ দিয়ে দেন ঠাকুরমশাই—ভারি বেলা হয়ে গেল।

বাবা, আরনিকা দু'ফোঁটা—

প্রিয়বাবু মেয়ের প্রতি চাহিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, না মা, না। এ আরনিকা কেস্ নয়। বিপ্নে হলে তাই দিয়ে দিত বটে, চার ফোঁটা একোনাইট তিরিশ শক্তি। দু'ঘণ্টা অন্তর খাবে।

সন্ধ্যা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, একোনাইট বাবা?

হাঁ মা, হাঁ। মৃত্যুভয়! পড়ে মরবো। সিমিলিয়া সিমিলিবস্ কিউরেণ্টার! মহাত্মা হেরিং বলেচেন, রোগের নয়, রুগীর চিকিৎসা করবে। মৃত্যুভয়ে একোনাইট প্রধান। বিপ্নে হলে—হুঃ—তবু, তবু হারামজাদা চিকিৎসা করতে আসে! রামময়, শিশি নিয়ে যাও আমার মেয়ের সঙ্গে। দু'ঘণ্টা অন্তর চারবার খাবে। ও-বেলা গিয়ে দেখে আসবো। ভাল কথা, পরাণে যদি এসে বলে, কৈ দেখি কি দিলে? খবরদার শিশি বার ক'রো না বলে দিচ্ছি। হারামজাদা ঢক্ ঢক্ করে হয়ত সবটা খেয়ে ফেলে আবার ক্যাষ্টর অয়েল রেখে যাবে! উঃ—পেটটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে যে!

রামময়কে ঔষধ দিতে সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ক্যাষ্টর অয়েল অতখানি ত সব খেয়ে আসোনি বাবা?

নাঃ—উঃ—গাড়ুটা কই রে?

তবে বুঝি তুমি—

না—না—না—দে না শীগ্‌গির গাড়ুটা। পোড়া বাড়ীতে যদি কোথাও কিছু পাওয়া যাবে! তবে থাক্ গে গাড়ু। বলিতে বলিতেই প্রিয়বাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রামময় কহিল, দিদিঠাকরুণ, ওষুধটা তা হলে—

সন্ধ্যা চকিত হইয়া বলিল, ওষুধ? হাঁ, এই যে দিই এনে।

ওই যে তুমি বললে আরনি না কি, তাই দু'ফোঁটা দিয়ে দাও দিদিঠাকরুণ—মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা না হয়—

সন্ধ্যা অন্তরে ব্যথা পাইয়া কহিল, আমি কি বাবার চেয়ে বেশি বুঝি, রামময় ?

রামময় লজ্জিত হইয়া বলিল, না—তা না—তবে মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা বড় জোর ওষুধ কি-না, দিদিঠাকরুণ—আমি রোগা মানুষ—বরঞ্চ গিয়েই না হয় সাঁতরাদের মেধোটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঠিয়ে দেবো—কাল থেকে তার পেট নাবাচ্চে—দাঠাকুরের ওষুধ দিলেই সে ভাল হয়ে যাবে। আমাকে ঐ তোমার ওষুধটাই আজ দাও দিদিমণি !

সন্ধ্যা বিষন্নমুখে কহিল, আচ্ছা, এসো এইদিকে।

এই বলিয়া সে রামময়কে সঙ্গে লইয়া বারান্দা দিয়া পাশের একটা ঘরে চলিয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী ঠাকুরঘরের জন্য এক ঘড়া জল আনিতে পুকুরে গিয়াছিলেন, বাড়ী ঢুকিয়াই জলপূর্ণ কলসটা দাওয়ার উপর ধপ্ করিয়া বসাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাক দিলেন, সন্ধ্যে ?

সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে হইতে সাড়া দিল, যাই মা।

মা কহিলেন, তোর বাবা এখনো ফেরেনি ? ঠাকুরপূজো আজ তা হলে বন্ধ থাক্ ?

মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বাবা ত অনেকক্ষণ এসেচেন, মা। তেল মেখে নাইতে গেছেন।

কই, পুকুরে ত দেখলুম না ?

তিনি যে কোথায় ছুটিয়া গেলেন সন্ধ্যা তাহা জানিত; একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ বোধ হয় তা হলে নদীতে গেছেন। অনেকক্ষণ হ'লো—এলেন বলে।

জগদ্ধাত্রী কিছুমাত্র শান্ত হইলেন না, বরঞ্চ অধিকতর উত্তপ্ত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এঁকে নিয়ে আর ত আমি পারিনে সন্ধ্যে, হয় উনিই কোথাও যান, না হয় আমিই কোথাও চলে যাই। বার বার বলে দিলুম, ভট্‌চাযিমশাই আসতে পারবেন না, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। তবু এই বেলা—ঠাকুরের মাথায় একটু জল পর্য্যন্ত পড়তে পেলে না—তা ছাড়া কাল রাত্তিরে কি করে এসেচে জানিস্? বিরাট পরামাণিকের সুদের সমস্ত টাকা মকুফ করে একেবারে রসিদ দিয়ে এসেচে।

সন্ধ্যা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বলিল, কে বললে মা?

কেন, বিরাটের নিজের বোনই বলে গেল যে। ভাজকে নিয়ে সে পুকুরে নাইতে এসেছিল।

সন্ধ্যা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাই-বোনে তাদের ঝগড়া মা, হয়ত কথাটা সত্য নয়।

মা রাগিয়া বলিলেন, কেন তুই সব কথা ঢাকতে যাস্ বল্ দিকি সন্ধ্যে? জ্বর বলে বিরাট নাপতে ডেকে নিয়ে গেছে, ওষুধ খেয়েচে, ধন্বন্তরি বলে পায়ের ধূলো নিয়েচে, জমিদার বলে, গৌরী সেন বলে ল্যাজ চুলকে দিয়েচে—তারা বলে আর হেসে লুটোপুটি! টাকা যাক, কিন্তু মনে হ'লো যেন আর ঘরে ফিরে কাজ নেই—ওই কলসীটাই আঁচলে জড়িয়ে পুকুরে ডুবে মরি। আজকাল যেন বড্ড বাড়িয়ে তুলেচে সন্ধ্যে,—আমি সংসার চালাই বা কি করে বল্ দিকি!

কত টাকা মা?

কত! দশ-বারো টাকার কম নয় বললুম। একমুঠো টাকা কিনা স্বচ্ছন্দে—

কথাটা তাঁহার সমাপ্ত হইতে পাইল না। প্রিয়বাবু আর্দ্রবস্ত্রে ব্যতিব্যস্তভাবে বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে চেঁচাইয়া ডাকিলেন, সন্ধ্যে

গামছা—গামছা—গামছাটা একবার দে দিকি মা। একোনাইট তিরিশ শক্তি—বাক্সর একেবারে কোণের দিকে—

জগদ্ধাত্রী অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, একোনাইট ঘোচাচ্ছি আমি। শ্বশুরের অন্নে জমিদার সাজতে লজ্জা করে না তোমার? কে বললে বিরাট নাপতেকে সুদ ছেড়ে দিতে? কার জায়গায় তুমি হাড়ি-দুলে এনে বসাও? কার জমি তুমি 'গোচর' বলে দান করে এসো। চিরটা কাল তুমি হাড়-মাস আমার জ্বালিয়ে খেলে! আজ—হয় আমি চলে যাই, না হয়, তুমি আমার বাড়ী থেকে বার হয়ে যাও।

সন্ধ্যা তীব্রকণ্ঠে কহিল, মা, দুপুরবেলা এ-সব তুমি কি সুরু করলে বল ত?

মা তেমনিভাবেই জবাব দিলেন, এর আবার দুপুর-সকাল কি? কে ও? ঠাকুর-পূজো সেরে উনুনের ছাই-পাঁশ দুটো গিলে যেন বাড়ী থেকে দূর হয়ে যায়। আমি অনেক সয়েচি, আর সইতে পারব না, পারব না, পারব না।

বলিতে বলিতেই তিনি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

হুঁঃ, বলিয়া প্রিয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, বললুম তাদের, জমিদার বলেই কি সুদের এতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে পারি বিরাট? তোরা বলিস্ কি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর তাদেরি বা দোষ কি? ওষুধ খাবে ত পথ্যির যোগাড় নেই। নেট্রাম দু-শ শক্তি একটা ফোঁটা দিয়ে—

সন্ধ্যার দুই চক্ষে অশ্রু টল্ টল্ করিতেছিল, সে অলক্ষ্যে আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কেন বাবা তুমি মাকে না জানিয়ে এ-সব হাঙ্গামার মধ্যে যাও?

আমি ত বলি যাবো না—কিন্তু পিণ্ড মুখুয্যে ছাড়া যে গাঁয়ের কিছুটি হবার যো নেই, তাও ত দেখতে পাই। কোথায় কার রোগ হয়েচে, কোথায় কার—

বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে না দিয়াই সন্ধ্যা চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ শুষ্কবস্ত্র ও গামছা আনিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল, আর দেরি ক'রো না বাবা, ঠাকুর-পূজোটি সেরে ফেলো। আমি আসচি।

এই বলিয়া সে তাহার ঘরে চলিয়া গেল এবং প্রিয়বাবুও মাথা মুছিতে মুছিতে বোধ করি বা ঠাকুর-ঘরের উদ্দেশ্যেই প্রস্থান করিলেন। বলিতে বলিতে গেলেন—ইঃ—আবার যে পেটটা কামড়াতে লাগল। পরাণের নামে—ইঃ—

যে গোলক চাটুয্যে মহাশয়ের নামে বাঘে ও গরুতে একত্রে এক-ঘাটে জলপান করে বলিয়া সেদিন রাসমণি বারম্বার সন্ধ্যাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই হিন্দুকুলচূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি এই-মাত্র তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানের পট্টবস্ত্র ও শিখাসংলগ্ন টাটকা একটি করবী পুষ্প দেখিয়া মনে হয় অনতিবিলম্বেই তাঁহার সকালের আহ্নিক ও পূজা সারা হইয়াছে। বাহিরের লোকজন তখনও হাজির হইয়া উঠিতে পারে নাই, ভৃত্য হুঁকায় নল করিয়া তামাক দিয়া গিয়াছিল, সুডৌল ভুঁড়িটি তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া, অন্যমনস্ক-মুখে তাহাই পান করিবার আয়োজন করি

ছিলেন, এমনি সময়ে অন্দরের কবাটটা নাড়িয়া উঠার শব্দে চোখ তুলিয়া বলিলেন, কে ?

অন্তরাল হইতে সাড়া আসিল, আমি। কিছু না খেয়েই যে বাইরে চলে এলেন বড় ? রাগ হ'লো নাকি ?

গোলক কহিলেন, রাগ ? না, রাগ-অভিমান আর কার ওপর করব বল ? সে তোমার দিদির সঙ্গে-সঙ্গেই গেছে। বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, না, এখন আর কিছু খাবো না। আজ গোকুলঠাকুরের তিরোভাব—সেই সন্ধ্যার পরেই একেবারে সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দেবো। এমনি করে যে কটা দিন যায়। বলিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকার নলটা মুখে দিলেন।

যে মেয়েটি নেপথ্য হইতে কথা কহিতেছিল, সে দ্বারটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, ঘরে আর কেহ আছে কি না দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। মেয়েটি বিধবা। দেখিতে কুশ্রী নয়, বয়সও বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই। পরিধানে মিহি শাদা ধুতি, হাতে কোন অলঙ্কার নাই, কিন্তু গলায় ইষ্টকবচ-বাঁধা একছড়া মোটা সোনার হার। একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনি এই-সব ঠাট্টা করেন, লোকে কি মনে করে বলুন ত ? তা ছাড়া, আমাকে কি ফিরে যেতে হবে না ? বলিয়া পরক্ষণেই মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া কহিল, যাকে সেবা করতে এলুম, তিনি ত ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন ; এখন ফিরে গিয়ে কি বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আবার দেখতে শুনতে হবে না ? আপনিই বলুন ?

গোলক তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ত বটেই। আমার সংসার অচল বলে ত আর কুটুম্বের মেয়েকে ধরে বাঁধা যায় না। আর তাই যদি না হবে, ঘরের লক্ষ্মীই বা এ বয়সে

ছেড়ে যাবে কেন? মধুসূদন! বেশ, তাই যাও একটা ভাল দিন দেখিয়ে। বোনের সেবা করতে এসেছিলে, সেবা দেখিয়ে গেলে বটে! গ্রামের একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

জ্ঞানদা মৌন হইয়া রহিল। গোলক কোঁচার খুঁট দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া মিনিট-খানেক নিঃশব্দে তামাক খাইয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, সতী-লক্ষ্মী, তাঁর দিন ফুরলো, চলে গেলেন। সেজন্য দুঃখ করিনে—কিন্তু সংসারটা বয়ে গেল। মেয়েরা সব বড় হয়েচে, যে যার স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্বশুর-ঘর করচে; তাদের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু ছোঁড়াটা এবার ভেসে যাবে।

জ্ঞানদা আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বালাই ষাট। আপনি ও-সব মুখে আনেন কেন?

গোলক মুখ তুলিয়া একটু ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, না আনাই উচিত বটে, কিন্তু সমস্তই চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিনা! মধুসূদন! তুমিই সত্য! ঘর-সংসারেও মন নেই, বিষয়-কর্ম্মও বিষের মত ঠেকচে। যে কটা দিন বাঁচি, ব্রত-উপোস করতে আর তাঁর নাম নিতেই কেটে যাবে। সেজন্যে চিন্তা নেই—একমুঠো একসন্ধ্যে জোটে ভালো, না জোটে ক্ষতি নেই—কিন্তু ওই ছোঁড়াটার আখের ভেবেই—মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

জ্ঞানদার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। গোলকের স্ত্রী তাহার মামাতো ভগিনী হইলেও সহোদরার ন্যায়ই স্নেহ করিতেন। তাই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদাকে স্মরণ করিলে, সে না আসিয়া কোনমতেই থাকিতে পারে নাই। সেই দিদি আজ মাসাধিক কাল হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাবার সময় নাকি ইহারই হাতে তাঁহার বছর দশেকের ছেলেটিকে সঁপিয়া গিয়াছেন।

রা

সে করুণকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি ত চিরকাল এখানে থাকতে পারিনে চাটুয্যেমশাই। লোকেই বা বলবে কি বলুন?

গোলক দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া কহিলেন, লোকে বলবে তোমাকে? এই গাঁয়ে বাস করে? ইহার অধিক কথা আর তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না।

জ্ঞানদা নিজেও ইহা জানিত, তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

গোলক কহিতে লাগিলেন, আমার কথায় কথা কইলে তাকে আর কোথাও বাস করতে হবে—গাঁয়ে হবে না। সে বড় ভাবিনে, ভাবি কেবল ছেলেটার জন্যে। সে নাকি তোমাকে বড্ড ভালবাসতো, তাই মরবার সময় তার সন্তানকে তোমারই হাতে দিয়ে গেল; কই আমার হাতে ত দিলে না?

জ্ঞানদা কষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া কহিল, সব ত বুঝি চাটুয্যে-মশাই, কিন্তু আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী যে এখনো বেঁচে রয়েচেন; আমি ছাড়া যে তাঁদের গতি নেই।

গোলক তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলেন, না গতি নেই! তুমিও যেমন! হাঁ, মুখুয্যে বেঁচে থাকতো ত একটা কথা ছিল, কিন্তু তাকে ত চোখেও দেখোনি। তেরো বছরে বিধবা হয়েচে—

জ্ঞানদা বলিল, হ'লাম বা বিধবা, চাটুয্যেমশাই—শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁদের সেবা আমাকে করতেই হবে।

গোলক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তবে যাও আমাদের সব ভাসিয়ে দিয়ে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ ছোটগিন্নী—

জ্ঞানদা রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আবার ছোটগিন্নী! বলেচি আপনাকে, লোকে হাসি-তামাসা করে। কেন, নাম ধরে ডাকতে কি হয়?

গোলক মুখখানা ঈষৎ প্রফুল্ল করিয়া বলিলেন, করলেই বা তামাসা ছোটগিন্নী। সম্পর্কটাই যে হাসি-তামাসার।

জ্ঞানদা হঠাৎ একটু হাসিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, না, তা হবে না, আপনি চিরকাল নাম ধরে ডেকেচেন—তাই ডাকবেন।

গোলক কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। বলিয়া, দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্মশ্রু-গুম্ফহীন মুখখানি বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে একটা উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া কতকটা যেন নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, বুকের মধ্যে দিবারাত্রি হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে,—হায় রে! আমার আবার হাসি, আমার আবার তামাসা! তবে মাঝে মাঝে—তা যাক, নাই বললুম—কেউ অসন্তোষ হয়, জীবনে যা করিনি, আজই কি তা করব? বিষয় বিষ! সংসার বিষ! কবে তোমার শ্রীচরণে একটু আশ্রয় পাবো! মধুসূদন!

জ্ঞানদা ছল্ ছল্ চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিল। গোলক বলিতে লাগিলেন, আবার জ্বালার ওপর জ্বালা, এর ওপর দিনরাত ঘটকের উৎপাত। তারা সবাই জানে, লুকোতে পারিনে, বলি—কথা তোমাদের মানি, কুলীনের কুল কুলীনকেই রাখতে হয় এও জানি; আবার শোকে-তাপে অকালে অসময়ে চুলগুলো পেকেচে তাও সত্যি, কিন্তু তবু ত পাকা চুল! এ নিয়ে আবার বিবাহ করা, আবার একটা বন্ধন ঘাড়ে করা সাজে, না মানায়? তুমি বল না ছোটগিন্নী?

জ্ঞানদা শুষ্ক একটুখানি হাসিয়া কহিল, বেশ ত, করুন না একটি বিয়ে।

গোলক কহিলেন, ক্ষ্যাপা না পাগল? আবার বিয়ে! লক্ষ্মীর মত তুমি যার ঘরে আছো—যতই বল না, অনাথ বোনপোটাকে

ভাসিয়ে যেতে পারবে না। সে মরণকালে হাতে তুলে দিয়ে গেছে—তার মান তোমাকে রাখতেই হবে, আমার আবার—কে ?

ভৃত্য মুখ বাড়াইয়া সংবাদ দিল, চোঙদারমশাই এসেচেন।

গোলক মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, আঃ, আর পারিনে। কাজ, কাজ, বিষয়, বিষয়—আমার যে এদিকে সব নিষ্ট হয়ে গেছে, তা কাকেই বা বোঝাই, কে বা বোঝে! মধুসূদন! কবে নিস্তার করবে! যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আসতে বল্ গে।

ভৃত্য অন্তর্হিত হইল, জ্ঞানদাও ও-দিকে দরজার বাহিরে গিয়া চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এবেলা কি তা হলে সত্যিই কিছু খাবেন না ?

গোলক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না। প্রভু গোলক ঠাকুরের তিরোভাবের দিন একটা পর্ব্বদিন। ছোটগিন্নী, আমাদের মত সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে বলেই তবু এখনো চন্দ্রসূর্য্য আকাশে উঠচে, জোয়ার-ভাটা নদীতে খেলচে। মধুসূদন! তোমারই ইচ্ছা!

জ্ঞানদা কহিল, তা হোক, একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দিতে দোষ নেই। একটু শীগ্গির করে আসবেন, আমি নিয়ে বসে থাকবো। এই বলিয়া সে অন্দরের কবাট রুদ্ধ করিয়া দিল।

সম্মুখের দ্বার দিয়া ভৃত্যের পশ্চাতে একজন ভদ্র ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন; গোলক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এসো চোঙদার, ব'সো। ভেবে মরি, একটা খবর দিতেও কি পারো না? ভুলো, যা, শূদ্রের হুঁকোয় শীগ্গির জল করে তামাক নিয়ে আয়।

বিষ্ণু চোঙদার প্রণাম করিয়া গোলকের পদধূলি লইয়া, ফরাসের একধারে উপবেশন করিয়া প্রথমে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তারপরে কহিলেন, দম ফেলবার ফুরসুৎ ছিল না বড়কর্ত্তা, তা পরে! যাক,

পাঁচশ আর তিনশ—এই আটশ জাহাজে তুলে দিয়ে তবে এলুম। আঃ—কি হাঙ্গামা!

দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল ও ভেড়া চালান দিবার গোপন কারবারে এই বিষ্ণু চোঙদার ছিল তাঁহার অংশীদার। তিন মাসের মধ্যে তিন হাজার পশু জোগান দিবার সর্ত্তে লেখাপড়া হইয়াছিল। তাই খবরটা শুনিয়া গোলক খুশি হইলেন না। অপ্রসন্ন-মুখে বলিলেন, মোটে আটশ? কন্‌টাক্টো ত তিন হাজারের—এখনো ত ঢের বাকি হে!

চোঙদার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, ছাগল-ভেড়া কি আর পাওয়া যাচ্ছে বড়কর্ত্তা, সব চালান, সব চালান—এই আটশ জোগাড় করতেই যেন জিব বেরিয়ে গেছে। তবু ত হরেন রামপুর থেকে চিঠি লিখেচে, আট-দশদিনেই আরও পাঁচ-সাতশ রেলে পাঠাচ্ছে—কেবল নাবিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া। আর সময় ত তিন মাসের—হয়েই যাবে নারায়ণের ইচ্ছেয়।

গোলক আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, তোমার উপরেই ভরসা। আমাকে ত এখন একরকম গেরস্ত-সন্ন্যাসী বললেই হয়—তোমার বৌঠাকরুণের মৃত্যুর পর থেকে টাকা-কড়ি, বিষয়-আশয় একেবারে বিষ হয়ে গেছে। কেবল ঐ নাবালক ছেলেটার জন্যে—তা টাকায় টাকা উতোর পড়বে বলে মনে হয় না?

চোঙদার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু টাকাটা পিটবে এবার আহম্মদ সাহেব। সাতশোর কন্‌টাক্টো পেয়েচে—আরও বেশি পেতো, শুধু সাহস করলে না টাকার অভাবে।

গোলক চোখের একটা ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, বড় নাকি?

চোঙদার বলিলেন, হুঁ—নইলে আমি ছেড়ে দিই!

গোলক ডান হাতটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুর্গা!

দুর্গা, রাম রাম! সকালবেলায় ও-কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে হে চোঙদার! জাতে ম্লেচ্ছ, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই—তা হাজার-দশেক টাকা মারবে বলে মনে হয়, না?

চোঙদার কহিলেন, বেশি! বেশি!

গোলক বলিলেন, লড়াইটা বেশিদিন চললে ব্যাটা দেখচি লাল হয়ে যাবে। তাই ত হে!

চোঙদার কহিলেন, নিঃসন্দেহ। তবে, বহুত টাকার খেলা—একসঙ্গে জোটাতে পারলে হয়।

গোলক কহিলেন, কন্‌টাক্টো দেখিয়ে কর্জ্জ করবে—শক্ত হবে কেন?

চোঙদার মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তা বটে, কিন্তু পেলে হয়। আমাকে বলছিল কি-না।

খবর শুনিয়া গোলক উৎসুক হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, বলছিল নাকি? সুদ কি দিতে চায়?

চোঙদার কহিলেন, চার পয়সা ত বটেই। হয়ত—

এই 'হয়ত'টাকে গোলক শেষ করিতে দিলেন না। রাগ করিয়া বলিলেন, চার পয়সা! টাকায় টাকা মারবে, আর সুদের বেলায় চার পয়সা! দশ আনা ছ আনা হয়ত, না হয় একবার দেখা করতে ব'লো।

চোঙদার আশ্চর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা আপুনিই দেবেন নাকি সাহেবকে? কথাটা কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে—

মুহূর্ত্তে গোলক নিজেকে সাবধান করিয়া লইয়া একটুখানি শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, রাধামাধব! তুমি ক্ষেপলে চোঙদার! বরঞ্চ পারি ত নিষেধ করেই দেবো। আর জানাজানির মধ্যে ত তুমি আর আমি। কিন্তু তাও বলি, টাকা ধার ও নেবেই, নিয়ে বাপের

শ্রাদ্ধ করবে, কি বাই-নাচ দেবে, কি গরু চালান দেবে—তাতে মহাজনের কি ? এই বলিয়া তাহার মুখের প্রতি সম্মতির জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজেই বলিলেন, তা নয় চোঙদার, শুধু একটা কথার কথায় বলচি যে, অত খোঁজ নিতে গেলে মহাজনের চলে না। কিন্তু আমাকে ত চিরকাল দেখে আসচো—ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্ম্মপথে থেকে ভিক্ষে করি সে ভালো, কিন্তু অধর্ম্মের পয়সা যেন কখনো না ছুঁতে হয়। কেবল তাঁর পদেই চিরদিন মতিস্থির রেখেচি বলেই আজ পাঁচখানা গ্রামের সমাজপতি। আজ মুখের একটা কথায় বামুনকে শূদ্দুর, শূদ্দুরকে বামুনের দলে তুলে দিতে পারি। মধুসূদন! তুমিই ভরসা! সেবার সেই ভারি অসুখে জয়গোপাল ডাক্তার বললে, সোডার জল আপনাকে খেতেই হবে। আমি বললুম, ডাক্তার, জন্মালেই মরতে হবে, সেটা কিছু বেশি কথা নয়; কিন্তু গোলক চাটুয্যেকে ও-কথা যেন আর দ্বিতীয়বার না কানে শুনতে হয়। কেনারামের পুত্র হররাম চাটুয্যের পৌত্র—যার একবিন্দু পাদোদকের আশায় স্বয়ং ভাঁড়ারহাটির রাজাকেও পাল্‌কি-বেহারা পাঠিয়ে দিতে হ'ত।

চোঙদার দ্বিতীয়বার প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ও-কথা কে আর অস্বীকার করবে বলুন,—ও ত পৃথিবীশুদ্ধ লোকে জানে।

গোলক প্রত্যুত্তরে শুধু কেবল একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! তুমিই ভরসা।

চোঙদার প্রস্থানের উপক্রম করিতে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, আর দেখ, হরেনের কাছ থেকে এলে, রেলের রসিদটা একবার দেখিয়ে যেয়ো।

চোঙদার ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে।

গোলক কহিলেন, তা হলে আটশ পাঁচশ হ'লো। বাকি রইল সতেরশ—মাস-তিনেক সময় আছে—হয়ে যাবে, কি বল হে?

চোঙদার বলিল, আজ্ঞে, হয়ে যাবে বই কি।

গোলক কহিলেন, তাই তোমাকে তখনই বলেছিলুম চোঙদার, একেবারে ওটা পুরোপুরি হাজার-পাঁচেকের কন্‌ট্রাক্টো করে ফেলো। তখন সাহস করলে না—

চোঙদার কহিল, আজ্ঞে, অতগুলো ছাগল-ভেড়া যদি জোগাড় না হয়ে ওঠে—

গোলক প্রতিবাদ করিলেন না, কহিলেন, তাই ভালো, তাই ভালো। ধর্ম্মপথে একের জায়গায় আধ, আধের জায়গায় সিকি হয় সেও ঢের, কিন্তু অধর্ম্মের পথে মোহরও কিছু নয়। বুঝলে না চোঙদার? মধুসূদন! তুমিই ভরসা।

চোঙদার আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলে, ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থ-সন্ন্যাসী চাটুয্যেমহাশয় দগ্ধ-হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন, বিষয়-কর্ম্ম বোধ করি বা নিদ্বেদ মনে ? বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু এমনি সময়ে অন্দরের দিকের কবাটটা ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দাসী মুখ বাড়াইয়া কহিল, মাসিমা একবার ভেতরে ডাকচেন।

গোলক চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বল্ ত সদু?

দাসী কহিল, একটুখানি জলখাবার নিয়ে বসে আছেন মাসিমা।

গোলক হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, তোর মাসির জ্বালায় আর আমি পারিনে সদু। পর্ব্বদিনটায় যে একবেলা উপবাস করব সে বুঝি তার সইলো না! এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যাইতে যাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, সংসারে থেকে পরকালের ছুটো কাজ করার কত না বিঘ্ন! মধুসূদন! হরি!

সন্ধ্যার শরীরটা কিছুদিন হইতে তেমন ভাল চলিতেছিল না। প্রায়ই জ্বর হইত এবং পিতার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া থাকিয়া সে যেন ধীরে ধীরে মন্দের দিকেই পথ করিতেছিল। মা বিপিন ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাবেন বলিয়া প্রত্যহ ভয় দেখাইতেছিলেন এবং ইহা লইয়া মাতায় কন্যায় একটু-না-একটু কলহ প্রায় প্রতিদিনই ঘটিতেছিল। আজ সায়াহ্নবেলায় সন্ধ্যা সম্মুখের বারান্দায় একটি খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া মাতৃ প্রদত্ত সাগুর বাটিটা চোখ বুজিয়া নিঃশেষ করিল এবং তাড়াতাড়ি একটা পান মুখে পুরিয়া দিয়া কোনমতে সেগুলার ঊর্দ্ধগতি নিবারণ করিল। এই খাদ্যবস্তুটার প্রতি তার অতিশয় বিতৃষ্ণা ছিল; কিন্তু তথাপি না খাওয়া এবং কম খাওয়া লইয়া আর তাহার কথা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল না। কোথাও না কোথাও হইতে মা যে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, ইহা সে নিশ্চয় জানিত। ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় সে একখানা বই পড়িতেছিল—তাহার খোলা পাতাটা উপুড় করিয়া কোলের উপর রাখা ছিল, সেইখানা পুনরায় হাতে তুলিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেই শুনিতে পাইল প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে ডাক আসিল, খুড়ীমা, কই গো?

যে বাড়ী ঢুকিয়াছিল সে অরুণ। তাহার জামা-কাপড় এবং পরিশ্রান্ত চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় সে এইমাত্র অন্যত্র হইতে আসিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য সন্ধ্যার পাণ্ডুর মলিন মুখের উপর একটা রক্তিমাভা দেখা দিয়া গেল। সে চোখ তুলিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বুঝি কোলকাতা থেকে আসচো অরুণদা?

অরুণ কাছে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, হাঁ, কিন্তু তোমাকে এমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? আবার জ্বর নাকি?

সন্ধ্যা বলিল, ঐ-রকম কিছু একটা হবে বোধ হয়; কিন্তু তোমার চেহারাটাও ত খুব তাজা দেখাচ্ছে না।

অরুণ হাসিয়া কহিল, চেহারার আর অপরাধ কি? সারাদিন নাওয়া-খাওয়া নেই—আচ্ছা প্যাটার্ন ফরমাস করেছিলে যা হোক, খুঁজে খুঁজে হয়রান। এই নাও।

এই বলিয়া পকেট হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া সন্ধ্যার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, খুড়ীমা কই? কাকা বেরিয়েচেন বুঝি? গেল শনিবারে কিছুতেই বাড়ী আসতে পারলাম না—তাই ওটা আনতে দেরী হয়ে গেল। কি বুনবে, পাখী পক্ষী, না ঠাকুর-দেবতা? না গোলাপফুলের-—

সন্ধ্যা কহিল, সে ভাবনার ঢের সময় আছে; কিন্তু যা আনতে সাত দিন দেরী হ'লো, তা দিতে কি ঘণ্টাখানেক সবুর সইত না? ইষ্টিসান থেকে বাড়ী না গিয়ে এখানে এলে কেন?

অরুণ সহাস্যে কহিল, নাওয়া-খাওয়া ত? সে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু ঘন ঘন এত অসুখ হতে লাগল কেন বল ত?

তাহার 'সন্ধ্যা' কথাটার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় কটাক্ষ সন্ধ্যার কর্ণমূলে আঘাত করিয়া একটখানি রাঙা করিয়া দিল, কিন্তু যেন লক্ষ্যই করে নাই এমনিভাবে সে রাগ করিয়া কহিল, তারই বা আর বাকি কি অরুণদা? যাও, আর মিছিমিছি দেরী করতে হবে না।

প্রত্যুত্তরে অরুণ পুনরায় হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি ক্রোধে সমস্ত মুখখানা কালো করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া

কহিলেন, পানটা আর চিবোস্‌নে সন্ধ্যে, ওটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে যত পারিস্‌ হাসি-তামাসা কর্‌। বলিয়াই কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত-মাত্র না করিয়া দ্রুতপদে ঘরে চলিয়া গেলেন।

অকস্মাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল! অরুণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল নির্ব্বাক্‌ হইয়া রহিল এবং সন্ধ্যা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণের জন্য সায়াহ্নের আকাশতল হইতে সমস্ত আলো যেন একেবারে নিবিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত এইভাবে থাকিয়া, মুখের পান ফেলিয়া দিয়া, সহসা কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এ-বাড়ীতে আর আসো অরুণদা? আমাদের সর্ব্বনাশ না করে কি তুমি ছাড়বে না?

প্রথমটা অরুণ একটা কথাও কহিতে পারিল না, তার পরে ধীরে ধীরে শুধু বলিল, মুখের পান ফেলে দিলে সন্ধ্যা—আমি কি সত্যিই তোমার অস্পৃশ্য?

সন্ধ্যা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার জাত নেই—ধর্ম্ম নেই; কেন তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে!

আমার জাত নেই? ধর্ম্ম নেই?

না নেই। তুমি বিলেত গেছো—তুমি ম্লেচ্ছ। সেদিন মা তোমাকে পেতলের ঘটিতে জল খেতে দিয়েছিল, তোমার মনে নেই?

অরুণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না, আমার মনে নেই। কিন্তু তোমার কাছে আজ আমি অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ!

সন্ধ্যা চোখ মুছিয়া কহিল, শুধু আমার কাছে নয়, সকলের কাছে! শুধু আজ নয়, যখন থেকে কারও নিষেধ শোনোনি—বিলেত চলে গেলে, তখন থেকে।

অরুণ কহিল, আমি মনে করেছিলাম—

কিন্তু কি মনে করিয়াছিল তাহা আর বলিতে পারিল না। নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া কহিল, আমি আর হয়ত এ-বাড়ীতে আসব না, কিন্তু আমাকে তুমি ঘৃণা ক'রো না সন্ধ্যা—আমি ঘৃণিত কাজ কখনো করিনি।

সন্ধ্যা কহিল, তোমার কি ক্ষিদে-তেষ্টা পায়নি অরুণদা? তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়াই করবে?

অরুণ কহিল, না, ঝগড়া আমি করব না। যে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবাদ করবার মত ছোট আমি নই। এই বলিয়া অরুণ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল,—সন্ধ্যা সেইদিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া যেন পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিল।

মা সুমুখে আসিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন, যাক্, আর বোধ হয় আসবে না।

সন্ধ্যা চকিত হইয়া বলিল, না।

মা বলিলেন, খামোকা ছুঁয়ে দিলে, যা, কাপড়খানা ছেড়ে ফেল্ গে।

সন্ধ্যা মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাপড়খানা পর্য্যন্ত ছেড়ে ফেলতে হবে?

তাহার ম্লান মুখের অন্তরের ছবি জননীর চোখে পড়িল না, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, হবে না? খ্রীষ্টেন মানুষ—বিধর্ম্মী, ম্লেচ্ছ, কার্ত্তিক হলে যে নেয়ে ফেলতে হ'ত। [illegible] ইয় আমার হাতেই দে না! করে বটে—কিন্তু [illegible] আচারে রাজরাণীর মত। কি বলিস্ নাতনী ছুঁড়ি ছুঁলে কি ছুঁলে না.

তবে দোরে তুললে! ন্ধ্যা পরিহাসে যোগ দিতে পারিত, কিন্তু

সন্ধ্যা কহিল, বেশ ত ম্বা পিতার প্রসঙ্গে উঠিয়া পড়া পর্য্যন্ত সে.

মা ঘাড় নাড়িয়াই আচ্ছা যাইতেছিল, মুখ তুলিয়া কঠিনভাবে

উপদেশ দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পিছন হইতে ডাক শুনিলেন, জগো ঘরে আছিস্ গা ?

গোলক চাটুযোমশাই একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিলেন ; জগদ্ধাত্রী ফিরিয়া চাহিয়া সাড়া দিলেন, ও মা, চাটুয্যেমামা যে ! কি ভাগ্যি !

কিন্তু সেদিনকার রাসু-মাসি ও কন্যার ঘটনাটা স্মরণ করিয়া তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গোলক মায়ের উত্তর না দিয়া মেয়েকেই সম্ভাষণ করিলেন ; সহাস্যে কহিলেন, বলি আমার সন্ধ্যে নাতনী কেমন আছিস্ গো ? যেন রোগা দেখাচ্ছে না ?

সন্ধ্যা বলিল, না, ভালো আছি ঠাকুর্দ্দা।

জগদ্ধাত্রী শুষ্কমুখে একটু হাসি আনিয়া বলিলেন, হাঁ, ভালই বটে ! মাস ঘুরতে চলল মামা, রোজ অসুখ, রোজ জ্বর। আজও ত সাবু খেয়ে রয়েচে।

গোলক কহিলেন, তাই নাকি ? তা হবে না কেন বাছা,— কোথায় আজ ও কাঁখে-কোলে ছেলে-পুলে নিয়ে ঘরকন্না করবে, না তোরা ওকে টাঙিয়ে রেখে দিলি ! পাত্রস্থ করবি কবে ? বয়স যে—

জগদ্ধাত্রী বয়সের কথাটা তাড়াতাড়ি চাপিয়া দিয়া বলিয়া নেই ? কি করব মামা, আমি একা মেয়েমানুষ আর কতদিকে

অরুণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গেরাহ্যি করে না ডাক্তারি নিয়েই তোমার কাছে আজ আমি অস্পৃশ্য, মামা যে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে

সন্ধ্যা চোখ মুছিয়া কহিল, শুধু আ[illegible]কি। তার পরে যার যা [illegible]ছে ! শুধু আজ নয়, যখন থেকে ব[illegible]তাঁহার কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইয়া বিলেত চলে গেলে, তখন থেকে।

অরুণ কহিল, আমি মনে করেছিল[illegible]চে কি ?

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তাই একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেও যে বাঁচি, ঘরে শেকল দিয়ে ফেলে রেখে দি। এ যে দুয়ের বার—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে খাক্ করে দিলে! এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা আঁচলে মুছিয়া ফেলিলেন।

গোলক সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, তাই বটে, তাই বটে—আমি অনেক কথাই শুনতে পাই। তা তোরাও ত বাপু ধনুকভাঙ্গা পণ করে আছিস্, স্বয়ং কার্ত্তিক নইলে আর মেয়ের বিয়ে দিবি না। আমাদের ভারি কুলীনের ঘরে তা কি কখনো হয়? না, হয়েচে বাছা? শুনিস্‌নি, তখনকার দিনে কত কুলীনকে গঙ্গাযাত্রা করেও কুলীনের কুল রক্ষা করতে হ'তো? মধুসূদন, তুমিই সত্য।

জগদ্ধাত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, কে তোমাকে বলেচে মামা, জামাই আমার ময়ূরে চড়ে না এলে মেয়ে দেবো না? মেয়ে আগে, না কুল আগে? বংশে কেউ কখনো শূদ্দুর বলে কায়েতের ঘরে পা ধুলে না, আর আমি চাই কার্ত্তিক! ছোটো ঘরে যাবো না এই আমার পণ—তা মেয়ে জলে ফেলে দিতে হয় দেবো।

গোকুল খুশী হইয়া বলিলেন, এই ত কথা? আচ্ছা, আমি দেখচি।

যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যা নতশিরে আরক্ত-মুখে দাঁড়াইয়াছিল। গোলক তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে রহস্য করিয়া বলিলেন, কার্ত্তিক যখন চাস্‌নে জগো, তখন মেয়েকে না হয় আমার হাতেই দে না! সম্পর্কেও বাধবে না, থাকবেও রাজরাণীর মত। কি বলিস্ নাতনী—পছন্দ হবে?

অন্য সময়ে হইলে সন্ধ্যা পরিহাসে যোগ দিতে পারিত, কিন্তু অরুণ হইতে আরম্ভ করিয়া পিতার প্রসঙ্গে উঠিয়া পড়া পর্য্যন্ত সে ক্রোধে, দুঃখে, লজ্জায় জ্বলিয়া যাইতেছিল, মুখ তুলিয়া কঠিনভাবে

জবাব দিল, পছন্দ কেন হবে না ঠাকুর্দ্দা ? দড়ির খাটের চতুর্দ্দোলায় চেপে আসবেন এইদিক দিয়ে, আমি মালা গেঁথে দাঁড়িয়ে থাকবো তখন। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে যে ভয়ানক রাগ করিয়া গেল তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ব্যর্থ পরিহাসের এই তীব্র লাঞ্ছনায় প্রথমটা গোলক অবাক্ হইয়া গেলেন, পরে হাঃ হাঃ করিয়া খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, মেয়ে ত নয়, যেন বিলিতি পল্টন। এ না হয় দাদা-নাতনী সম্পর্ক—বলতেও পারে, কিন্তু সেদিন রাসুর মুখে শুনলাম নাকি যা মুখে এসেচে তাই বলেচে! মা-বাপ পর্য্যন্ত রেয়াৎ করেনি!

গোড়ায় জগদ্ধাত্রীর ঠিক এই ভয়ই ছিল, কেবল মাঝখানে আশা করিয়াছিলেন পরিহাসের মধ্য দিয়া বুঝি এবারের মত ফাঁড়া কাটিয়া গেল। হয়ত কাটিয়াই যাইত, শুধু মেয়েটাই আবার নিরর্থক খোঁচা মারিয়া বিবরের সর্পকে বাহিরে আনিয়া দিল। কন্যার প্রতি তাঁহার বিরক্তির অবধি রহিল না, কিন্তু প্রকাশ্যে সবিনয়ে কহিলেন, না মামা, সন্ধ্যা ত সে-সব কিছুই বলেনি। মাসি তিলকে তাল করেন, সে ত তুমি বেশ জানো?

গোলক কহিলেন, তা জানি, কিন্তু আমার কাছে করে না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, আমি যে তখন দাঁড়িয়ে মামা?

গোলক হাসিয়া বলিলেন, তা হলে ত আরও ভালো। শাসন করতেও বুঝি পারলিনে?

এই হাসিটুকুতে জগদ্ধাত্রী মনে মনে একটু বল পাইয়া সক্রোধে কহিলেন, শাসন? তুমি দেখো দিকি মামা, ওর কি দুর্গতিটাই আমি করি!

গোলক স্নিগ্ধভাবে বলিলেন, থাক্ দুর্গতি করে আর কাজ নেই

—বিয়ে হলে, সংসার ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব শুধরে যাবে, তবে শাসনে একটু রাখিস্। কালটা বড় ভয়ানক কিনা! অরুণ আসে আর?

জগদ্ধাত্রী ভয়ে মিথ্যা বলিয়া ফেলিলেন, অরুণ? না—

গোলক বলিলেন, ভালই। ছোঁড়াটাকে দিস্‌নে আসতে। অনেক রকম কানা-কানি শুনতে পাই কিনা।

অরুণকে সন্ধ্যা ছেলেবেলা হইতে দাদা বলিয়া ডাকে। সে বিলাত যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ-বংশের এতটাই নীচের ধাপের যে, এই স্নেহ সম্বন্ধও কোন কারণেই যে আর কোন আকারে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতে পারে, এ সংশয় স্বপ্নেও মায়ের মনে ছায়াপাত করে নাই। কিন্তু কিছুদিন হইতে সন্ধ্যার আচরণে ও কথায়-বার্ত্তায় মাঝে মাঝে এমনই একটা তীব্র জ্বালা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিত যে, তাঁহার মুদ্রিত চক্ষেও তাহার আভাস পড়িত; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জিনিষটা এতখানিই অসম্ভব যে এ লইয়া উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। এখন ইহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত অপরের মুখে শুনিয়া সহসা তিনি ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, তিক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, শুনলে অনেক জিনিষই শোনা যায় মামা, কিন্তু আমার মেয়ের কথা নিয়ে লোকেরই বা এত মাথা-ব্যথা কেন?

গোলক মৃদু হাসিয়া ধীরভাবে বলিলেন, তা সত্যি বোন; কিন্তু সময়ে সাবধান না হলে লোকের পোড়ার মুখও যে বন্ধ করা যায় না জগো!

জগদ্ধাত্রী ইহারও প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঠিক এইসময়েই সন্ধ্যার কাণ্ড দেখিয়া তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে ও নিদারুণ ক্রোধে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা পুকুর হইতে স্নান

করিয়া বাড়ী ঢুকিতেছিল, তাহার কাপড় ভিজা, মাথার চুলের বোঝা হইতে জল ঝরিতেছে, এখনও মুছিবার অবকাশ হয় নাই—এই অবস্থায় পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতবেগে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোলক কহিলেন, মেয়ের জ্বর বললিনে জগো? সন্ধ্যেবেলায় নেয়ে এলো যে?

জগদ্ধাত্রী কেবলমাত্র জবাব দিলেন, কি জানি মামা! কিন্তু মনে মনে তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, এ তাঁহারই বিরুদ্ধে অরুণের অপমানের গূঢ় সুকঠোর প্রতিশোধ।

গোলক কহিলেন, এমন অত্যাচার করলে যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াবে!

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, দাঁড়ালেই বা কি করব বল? ও আমার হাতের বাইরে।

গোলক মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, তা বুঝেচি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এ-বাড়ীর কর্ত্তাটা কে? তুই, না জামাই, না তোর মেয়ে?

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, সবাই কর্ত্তা।

গোলক কহিলেন, তা হলে তাদের বলিস্ যে, পাড়ার মধ্যে দুলে-বাগ্দী প্রজা রাখা চলবে না। তারা এর একটা ব্যবস্থা না করলে শেষে আমাকেই করতে হবে। মধুসূদন! তুমিই ভরসা।

প্রত্যুত্তরে জগদ্ধাত্রী সক্রোধে ডাক দিলেন, সন্ধ্যে, এদিকে আয়!

সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে বোধ হয় মাথা মুছিতেছিল, একটুখানি মুখ বাড়াইয়া সাড়া দিল, কেন মা?

মা বলিলেন, দুলে-মাগীদের সরাবি, না আমাকেই কাল নাইবার আগে ঝাঁটা মেরে তাড়াতে হবে?

সন্ধ্যা কহিল, দুঃখী অনাথা মেয়ে দুটোকে ঝাঁটা মারা ত শক্ত কাজ নয় মা, কিন্তু ওরা কি কারও কোন ক্ষতি করেচে?

গোলক ইহার জবাব দিলেন। কহিলেন, ক্ষতি করে বই কি। পরশু বেড়িয়ে যাবার সময় দেখি পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছাগলটাকে ফ্যান খাওয়াচ্ছে। ছিটকে ছিটকে পড়চে ত? বলিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীর মুখের পানে চাহিলেন।

জগদ্ধাত্রী তৎক্ষণাৎ সমর্থন করিয়া কহিলেন, পড়বে বই কি মামা।

গোলক কহিলেন, তবে সেই বল্। না জেনে সাপের বিষ খাওয়া যায়, কিন্তু জেনে ত আর পারা যায় না!

সন্ধ্যার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, তোমার কাঁচা বয়স নাতনী, তুমি না হয় রাত্তিরেও নাইতে পারো, কিন্তু আমি ত পারিনে!

সন্ধ্যা অন্তরের দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, সে জানি ঠাকুর্দ্দা, কিন্তু বাবা যখন ওদের স্থান দিয়েচেন, তখন আর কোথাও একটা আশ্রয় না দিয়েও ত তাঁর অপমান করতে পারিনে।

মেয়ের এই মান-অপমানের ধারণায় মায়ের মুখ দিয়া রাগে কথা বাহির হইল না; কিন্তু গোলক বলিলেন, বেশ ত, তারই বা অভাব কি সন্ধ্যা? অরুণের বাড়ীর পিছনে ত ঢের জায়গা আছে, তাকেই বল্ না আশ্রয় দিতে। বাগ্দী-দুলে হোক, তবু তারা হিঁদু—তাতে জাত যাবে না। এই বলিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার রসিকতার রস-গ্রহণ জগদ্ধাত্রী যত বেশী না করুন, অরুণের কথায় পাছে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েটা ভয়ানক কঠোর কিছু বলিয়া বসে এই ভয়ে তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

ঠিক তাহাই ঘটিল। সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে পরিহাসের তরলতা

উছলিয়া উঠিল ; কিন্তু কথাগুলা শুনাইল যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি শক্ত,—কহিল, গেলেই বা কে তার জমা-খরচ রাখচে বলুন ? যে জাতই মানে না, তার আবার যাওয়া আর থাকা !

গোলক হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখ তাঁহার কালো হইয়া উঠিল। বলিলেন, তোমার সঙ্গে এই-সব বুঝি পরামর্শ চলে ?

সন্ধ্যা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হায় হায়, ঠাকুর্দ্দা, সে আপনাদেরই গ্রাহ্য করে না—কুকুর-বেড়ালের সামিল মনে করে, তা আমি ! এই বলিয়া সে বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চক্ষের পলকে ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ধমক দিয়া উঠিলেন, হতভাগী ! পরের ছেলের নামে তুই মিথ্যে অপবাদ দিস্ ! তাকে কে না জানে ? সে কখনো এ-কথা বলেনি—আমি গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি।

ঘরের মধ্য হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। গোলক কহিলেন, না জগো, আজকালকার ছেলে-মেয়েরা সব এমনিই বটে। তা বেশ, না হয় কুকুর-বেড়ালই হলুম ; কিন্তু একটা কথা বলে যাই আজ, আর মেয়ের বিয়ে দিতে দেরী করিস্‌নে। যেখানে হোক দিয়ে ফেলে পাপ চুকিয়ে দে, চুকিয়ে দে।

জগদ্ধাত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দাও না মামা একটা দেখে-শুনে। আর যে আমি ভাবতে পারিনে।

গোলক মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আচ্ছা, দেখি ; কিন্তু কি জানিস্ মা, এক মেয়ে, দূরে বিয়ে দিয়ে কিছুতে থাকতে পারবিনে, কেঁদে-কেটে মরে যাবি। আমাদের স্বভাবের ঘরে পাত্রের বয়স দেখতে গেলে চলে না। তবে কাছাকাছি হয়, দু'বেলা চোখের দেখাটা দেখতে পাস্ ত তার চেয়ে সুখ আর নেই।

জগদ্ধাত্রী চোখ মুছিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, কোথায় পাবো মামা এ সুবিধে ? তবে ঘর-জামাই—

গোলক কথাটা শেষ করিতেও দিলেন না, বলিলেন, ছি ছি, অমন কথা মুখেও আনিস্‌নে জগো, ঘর-জামাইয়ের কাল আর নেই, তাতে বড় নিন্দে। আর যদিও বা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ ধরে আনিস্, গাঁজা-গুলি আর মাতলামি করেই তোর যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে দেবে। বলি, নিজের কথাটাই একটু ভেবে দেখ্ না।

ইহার নিহিত ইঙ্গিত অনুভব করিয়া জগদ্ধাত্রী চক্ষের নিমেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, চিরকালটাই দেখচি মামা, চিরকালটাই জ্বলে-পুড়ে মরচি।

গোলক মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, তবে তাই বল্। বিনা কাজ-কর্ম্মে বসে বসে খেলেই এমনি হবে। এ কি আর তোর মত বুদ্ধিমতী বুঝতে পারে না ?

জগদ্ধাত্রী আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, বুঝি বই কি, ভেতরে ভেতরে সব বুঝি ; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, কোনদিকে চেয়ে যে কূল-কিনারা দেখতে পাইনে।

গোলক আশ্বাস দিয়া কহিলেন, পাবি, পাবি। তাড়াতাড়ি কি—দেখি না একটু ভেবে-চিন্তে। কিন্তু আজ যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

জগদ্ধাত্রী মিনতি করিয়া বলিলেন, মামা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রইলে, একটু বসবে না ?

গোলক বলিলেন, না না, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে —আজ বিলম্ব করব না। এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে আগাইয়া দিতে সদর দরজার বাহিরে পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

সকালবেলায় প্রিয় মুখুয্যেমশাই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্র্যাক্‌টিসে চলিতেছিলেন, বগলে চাপা একতাড়া হোমিওপ্যাথি বই, হাতে তোয়ালে-বাঁধা ঔষধের বাক্স, পিছনে পিছনে এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রী মিনতি করিয়া চলিয়াছিল, বাবাঠাকুর, তুমি দয়া না করলে আমরা যাই কোথাকে ?

প্রিয়র মুখ ফিরাইয়া কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, তিনি বাঁ হাতটা পিছনে নাড়িয়া বলিয়া দিলেন, না, না, না—তোদের আর আমি রাখতে পারব না, তোরা বড় বজ্জাত। কেন তুই ছাগলকে ফ্যান খাওয়ালি ?

দুলেবৌ বিস্মিত হইয়া বলিল, সক্কলের প্যাঁটা-পেঁটি ত ফ্যান খায় বাবাঠাকুর !

প্রিয়নাথ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ফের মিথ্যে কথা হারামজাদী। কারু ছাগল ফ্যান খায় না। ছাগল খায় ঘাস।

দুলেবৌ কহিল, ঘাস খায়, পাতা-পত্তর খায়, ফ্যানও খায় বাবাঠাকুর।

প্রিয় তেমনি হাত নাড়িয়া বলিয়া দিলেন, না, না, তোদের আর আমি রাখবো না, তোরা আজই দূর হ ! গোলক চাটুয্যে বলে গেছে, বামুনপাড়ায় তোরা ছাগলকে ফ্যান খাইয়েচিস্। আর তোদের ওপর আমার দয়া নেই—তোরা বড় বজ্জাত।

দুলেবৌ শেষ মিনতি করিয়া কহিল, ফ্যানটুকু কি তবে ফেলে দেবো বাবাঠাকুর ?

প্রিয় অসঙ্কোচে কহিলেন, হাঁ দিবি। তোদের গরু থাকতো

খাওয়াতিস্, দোষ ছিল না ; কিন্তু এ যে ভয়ানক কথা। আজই উঠে যা বুঝলি ? উঃ—বড্ড বেলা হয়ে গেছে—সল্‌ফর দেবার সময় বয়ে যায়। বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতবেগে প্রস্থানের উদ্যম করিতেই, দুলেবৌ পিছন হইতে করুণ-স্বরে কহিল, বাবাঠাকুর, কাল চোপ্‌পর রাত মেয়েটার পেটে লক্ষ্মীর দানাটুকু যায়নি—

প্রিয় তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কেন, কেন ? পেট নাবাচ্চে ? গা বমি বমি করচে ?

দুলেবৌ মাথা নাড়িল।

তবে কি ? পেট ফুলচে ? ক্ষিদে নেই ?

ক্ষিদে বড্ড বাবাঠাকুর।

প্রিয় কহিলেন, ওঃ—তাই বল্। সেও একটা মস্ত রোগ—ন্যাট্রাম, আইয়োডম, আরও ঢের ওষুধ আছে। এতক্ষণ ঘিনঘিন কেন—দেখে-শুনে যে একদাগ খাইয়ে দিতে পারতাম ! চল্ দেখি—

দুলেবৌ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, ওষুধ চাই না বাবাঠাকুর, দুটো চাল পেলে মেয়েটাকে ফুটিয়ে দিই—

প্রিয় ক্ষণকাল বিস্মিতের মত চাহিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, ওষুধ চাইনে, চাল চাই ! দূর হ হারামজাদী আমার সুমুখ থেকে। ছোটজাতের মুখে আগুন !

দুলেবৌ লজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে প্রিয় ধমক দিয়া বলিলেন, খেতে পাস্‌নি ত সন্ধ্যের কাছে গিয়ে বল্ গে না।

দুলেবৌ শুধু নীরবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

প্রিয় কহিলেন, গিন্নীর কাছে গিয়ে যেন মরিস্‌নে। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্ গে, দিদিঠাকরুণ এলে বলিস্ আমার বড় ওষুধের বাক্সে একটা আট-আনি আছে দিতে। কিন্তু খবরদার বলে দিচ্ছি, ব্যামো হলে আগে আমাকে ডাকতে হবে। তখন যে বিপ্‌নের কাছে

গিয়ে—কে হে ত্রৈলোক্য নাকি? ষষ্ঠীচরণ যে! বলি বাড়ীর সব খবর ভাল ত?

দুলেবৌ আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। ত্রৈলোক্য ও ষষ্ঠীচরণ সম্মুখে আসিয়া প্রাতঃপ্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে খবর সব ভাল। সবাই ভাল আছে।

প্রিয় অস্ফুটে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, ভাল, ভাল। যে দিন-কাল পড়েচে, আমার ত নাইবার-খাবার সময় নেই। ঘরে ঘরে সর্দ্দি-কাশি, একটু অবহেলা করেচ কি ব্রঙ্কাইটিস। সকালেই যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ত্রৈলোক্য কহিল, আজ্ঞে, আপনারই কাছে।

প্রিয় উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কেন, আমার কাছে কেন?

ত্রৈলোক্য কহিল, লোকজনের চলাচলের বড় দুঃখ হচ্ছে জামাই-বাবু, তাই খালটার ওপরে একটা সাঁকো তৈরি করচি। আপনার ওই বৈকুণ্ঠের দরুণ ছোট বাঁশ-ঝাড়টা না দিলে ত আর কিছু হয় না।

প্রিয় রাগ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি দিতে যাবো কেন? গাঁয়ে কি আর মানুষ নেই?

বুড়া ষষ্ঠীচরণ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার সে ঘাড় নোয়াইয়া আর একটা প্রণাম করিয়া বলিল, যদি অভয় দেন ত বলি জামাইবাবু, এ গাঁয়ে আপনি ছাড়া আর মানুষ নেই। আপনি দয়া করেন ত দশজনে চলে বাঁচবে, নইলে আমরা চাষী-মানুষ, কোথায় পাবো বাঁশ কেনবার টাকা?

প্রিয় একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, লোকজনের কি কষ্ট হচ্ছে নাকি?

ত্রৈলোক্য কহিল, মরে যাচ্ছে বাবাঠাকুর, হাত-পা ভেঙে একেবারে মরে যাচ্ছে।

প্রিয় কহিলেন, কিন্তু গিন্নী শুনলে যে ভারি রাগ করবে?

ষষ্ঠীচরণ কহিল, আপনি দিলে মাঠাকরুণ করবেন কি? তখন না-হয় সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ব।

প্রিয় চিন্তিত-মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, লোক-জনের কষ্ট হচ্ছে, আচ্ছা, নাও গে যাও--কিন্তু গিন্নী যেন শুনতে না পায়। উঃ—বড় বেলা হয়ে গেল—রস্‌কে বাগ্দীর পরিবারটা রাত্রে কেমন ছিল কে জানে। ব্রায়োনিয়ার অ্যাক্‌শানটা—নড়লে-চড়লে ব্যথা—হতেই হবে। আচ্ছা, চললুম—চললুম! বলিয়া প্রিয় দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বুড়া ষষ্ঠীচরণ একটু হাসিল; কিন্তু ত্রৈলোক্য কহিল, ক্ষ্যাপাটে লোকে বলে বটে, কিন্তু খুড়ো, পাগলাঠাকুর ছাড়া গরীব-দুঃখীর দরদও কেউ বোঝে না। মন যেন গঙ্গাজলের মত শাদা। এই বলিয়া সে যেদিকে পাগলাঠাকুর অন্তর্হিত হইয়াছিল সেইদিকে মুখ করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিল।

ষষ্ঠীচরণ বলিল, হুকুম হয়ে গেল, আর দেরী নয় ত্রৈলোক্য, কাজটা শেষ করে ফেলতে পারলে হয়।

ত্রৈলোক্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তাই চল খুড়ো।

দুই

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। অরুণ তাহার পড়িবার ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া, কড়িকাঠের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল। তাহার ক্রোড়ের উপর বই খোলা, কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই দেখা যাইত যে, এ কেবল সন্ধ্যার অজুহাতেই পড়া বন্ধ হয় নাই, বরঞ্চ আলো যখন যথেষ্ট ছিল, তখনও ঐ বই ওখানে অমনি করিয়াই পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ সেইদিন হইতে সে কাজেও যায় নাই, বাড়ীর বাহির পর্য্যন্ত হয় নাই। এই কয়টা দিন তাহার কেবল একটা কথাই বার বার মনে পড়িয়াছে যে, একজনের কাছে সে একেবারে অস্পৃশ্য হইয়া গেছে। ঘৃণা এবং অশুচিতা এতদূরে গিয়াছে যে, তাহাকে ছুঁইয়া ফেলিলেও একজনের মুখের পান ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন হয়।

সহসা তাহার চিন্তা বাধা পাইল। দ্বারের কাছে একটা শব্দ শুনিয়া সে চোখ নামাইয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ওখানে?

আমি সন্ধ্যা,—বলিয়া সাড়া দিয়া সন্ধ্যা দরজা খুলিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ ব্যস্ত হইয়া পা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একান্ত বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি এখানে? এমন সময়ে যে? ঘরে এসে ব'সো?

সন্ধ্যা কহিল, আমার বসবার সময় নেই। আমি পুকুরে গা ধুতে

এসে তোমার এখানে লুকিয়ে এসেচি। আমাদের একটা মান রাখবে অরুণদা?

অরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল, মান? তোমাদের? নিশ্চয় রাখব সন্ধ্যা।

তা আমি জানতুম, বলিয়া সন্ধ্যা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বাবার কাছে শুনলুম এ ক'দিন তুমি কাজে যাওনি, বাড়ী থেকে পর্য্যন্ত বেরোওনি—কেন শুনি?

আমার শরীর ভাল নেই।

সন্ধ্যা কহিল, না থাকা আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু তা নয়। বাবা তা হলে সকলের আগে সেই কথাটাই বলতেন।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। সন্ধ্যা নিজেও একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, কারণ আমি জানি অরুণদা। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে তুমি আর কখনো যেয়ো না।

অরুণ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—শুধু কেবল তোমাদের বাড়ীতে নয়—এ গ্রামের বাস তুলে দিয়ে আর কোথাও যাবো কি না, যেথায় বিনা-দোষে মানুষ মানুষকে এত হীনভাবে, এত লাঞ্ছিত করে না—আমি সেই কথাই দিন-রাত ভাবচি।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে?

অরুণ বলিল, জন্মভূমিই ত আমাকে ত্যাগ করচে সন্ধ্যা। আজ তোমার কাছেও আমি এমন অশুচি হয়ে গেছি যে, তোমাকেও মুখের পান ফেলে দিতে হ'লো। এই ঘৃণা সয়েও কি আমাকে তুমি এই গ্রামে থাকতে বল?

সন্ধ্যা নিরুত্তরে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ কহিল, আচারের নাম দিয়ে এই চিরাগত সংস্কার তোমাদের মনটাকে হয়ত আর স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না, কিন্তু যেখানে করে সেখানে মানুষের হাত

থেকে মানুষের এই লাঞ্ছনা মানুষকে যে বেদনায় কতদূর বিদ্ধ করতে পারে, এই কথাটা যে একদিন আমাকে এমন করে অনুভব করতে হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু এ লাঞ্ছনা কি তুমি নিজেই টেনে আনোনি অরুণদা ?

অরুণ কহিল, কি জানি। কিন্তু, আচ্ছা সন্ধ্যা, প্রায়শ্চিত্ত করলে কি এর কোন উপায় হয় বলতে পারো ?

সন্ধ্যা বলিল, হতে পারে, কিন্তু একদিন আত্মমর্য্যাদা হারাবার ভয়ে তুমি রাজি হওনি—আবার আজ যদি নিজেই তাকে বিসর্জ্জন দাও ত, আমি বলি অরুণদা, তুমি আর যাই কর, এখানে আর থেকো না।

অরুণ কহিল, কিন্তু তোমার ঘৃণা যে সেখানেও আমাকে টিকতে দেবে না।

কিন্তু তাতেই বা তোমার কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি ?

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা! এ-কথা তুমিও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে ?

সন্ধ্যা বলিল, তুমি যে আমার লজ্জার, আমার সঙ্কোচের আবরণটুকু রাখতে দিলে না অরুণদা। আভাসে ইঙ্গিতে তোমাকে কতবার জানিয়েচি, সে কিছুতেই হয় না, তবুও তোমার ভিক্ষার জবর-দস্তি যেন কোনমতেই শেষ হতে চায় না। বাবা রাজি হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি ত ভুলতে পারিনে আমি কতবড় বামুনের মেয়ে!

অরুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আর আমি ?

সন্ধ্যা বলিল, তুমিও আমার স্বজাতি—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেড়াল ত এক নয় অরুণদা। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই সে নিজেই যেন মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

অরুণ আর কথা কহিল না, কেবল তাহার মুখের উপর হইতে নিজের বিস্মিত ব্যথিত চোখ দুটি সরাইয়া লইল।

সন্ধ্যা জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তুমি যেখানেই যাও না অরুণদা, আমাকে কিন্তু সহজে ভুলতে পারবে না। অনেককাল তোমার মনে থাকবে, বার বার এত অপমান তোমাকে কেউ করেনি।

অরুণ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যেজন্যে এসেছিলে তা ত এখনো বলনি?

সন্ধ্যা প্রত্যুত্তরে একটু হাসিল। একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, পৃথিবীতে আশ্চর্য্যের আর অন্ত নেই। তারপর কি একটা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া কহিল, অথচ আমার মান তুমি না রাখলে পৃথিবীতে আর কেউ রাখবার নেই। এ তোমার বিশ্বাস হয় অরুণদা?

অরুণ শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রীকে আর তার মেয়েকে এককড়ির বাপ তাড়িয়ে দিয়েচে, কিন্তু আমার বাবা তাদের ডেকে এনেচেন। আমি দিয়েচি তাদের আশ্রয়।

কোথায়?

আমাদের পুরানো গোয়াল-ঘরে। কিন্তু বামুনপাড়ার মধ্যে তারা থাকতে পাবে না।

অরুণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সন্ধ্যা বলিল, কেন কি? তারা যে দুলে? তারা আমাদের পুকুরঘাট থেকে খাবার জল নেয়, তারা পথের ওপর ছাগলকে ফ্যান্ খাওয়ায়—গোলকঠাকুর্দ্দা না জেনে পাছে মাড়িয়ে ফেলেন—মা প্রতিজ্ঞা করেচেন কাল সকালে তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করে তবে

স্নান করবেন। তুমি তাদের স্থান দাও অরুণদা—তাদের কিছু নেই—তারা একেবারে নিরাশ্রয়।

অরুণ কহিল, বেশ, কোথায় স্থান দেবো?

সন্ধ্যা বলিল, তা আমি জানিনে—যেখানে হোক। তুমি ছাড়া আর আমি কাকে গিয়ে বলব?

অরুণ একটু ভাবিয়া বলিল, আমার উড়ে মালীটা বাড়ী চলে গেছে—তার ঘরটাতে কি তারা থাকতে পারবে? না হয় একটু-আধটু সারিয়ে দেবো।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিল না, কেবল অধোমুখে মাথা নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

অরুণ কহিল, তা হলে তাদের পাঠিয়ে দাও গে। মালীটা ফিরে এলে তার অন্য ব্যবস্থা করে দেবো।

সন্ধ্যা ইহারও জবাব দিতে পারিল না। তেমনি নত-নেত্রে থাকিয়া বোধ হয় আপনাকে সামলাইতে লাগিল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল, এখন আমার মুখেও পান নেই, গা ধুতেও এসেছিলাম। এই সময় তোমাকে একটু প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে যাই। এই বলিয়া সে গড় হইয়া নমস্কার করিয়া তাহার পায়ের ধূলো মাথায় দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অরুণ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিবার, বা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিল না, কেবল সেইদিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বোধ করি দিন দুই পরে হইবে, জগদ্ধাত্রী তাঁহার পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথের মধ্যে রাসমণি দেখা দিলেন। তাঁহার সমস্ত চোখ-মুখ উত্তেজনা ও আগ্রহের আতিশয্যে কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিয়াছে ; কাছে আসিয়া গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, জগো, মা আমার, তোর ওই পাগলি মেয়েটা কি শেষে এমন তপিস্যেই করেছিল ! অ্যাঁ, এ যে স্বপনের অতীত !

জগদ্ধাত্রী কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু এঁর মুখে কেবল মেয়েটার নাম শুনিয়াই মনে মনে ভয় পাইলেন। উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে মাসি ? কি করেচে সন্ধ্যে ?

রাসমণি বলিলেন, যা করেচে তা পৃথিবীতে কোন্ মেয়ে কবে করেচে শুনি ? যা, ভিজে কাপড়ে, ভিজে চুলে গিয়ে শ্রীধরকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কর্ গে। পঞ্চাননের আর বিশালাক্ষীর থানে পূজো পাঠিয়ে দি গে ; কিন্তু আমাকে বাছা, ইষ্টি-কবজখানি গলায় ধারণ করতে একটি সরু সোনার গোট তৈরি করিয়ে দিতে হবে, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখচি।

জগদ্ধাত্রী আকুল হইয়া কহিলেন, কি হয়েচে মাসি ? খুলে না বললে বুঝব কি করে ?

রাসমণি একটু হাসিয়া বলিলেন, খুলে বলতে হবে ? তবে বলি। তোরা মায়ে-ঝিয়ে ঢের পুণ্যি করেছিলি, নইলে এ কখনো হয় না। ভেবে মরছিলি মেয়েটার বিয়ে দিবি কি করে,—এখন যা—একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে ব'স্ গে।

কথা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাসমণি সদয়-কণ্ঠে কহিলেন, তোর একার দোষ নেই জগো, শুনে আমিও অমনি করে চেয়েছিলুম, মনে হ'লো বুঝি-বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখচি।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, খুলে বল না মাসি কি হয়েচে? আমি যে আকাশ-পাতাল ভেবে মরে গেলুম।

রাসমণি তখন জগদ্ধাত্রীর বাম বাহুটা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, কথাটা গোপনে রাখিস্ মা, আহ্লাদে এখুনি জানাজানি করে ফেলিস্-নে—ভাঙচি পড়ে যেতে পারে। আমাকে ছাড়া নাকি চাটুয্যেদাদা আর জন-প্রাণীকে বিশ্বাস করেন না, তাই সকালেই ডেকে আমাকে বললেন, রাসু, জগদ্ধাত্রীকে খবরটা দিয়ে এসো গে দিদি। তার মেয়ের জন্যে আর ভেবে মরতে হবে না—আমার হাতেই সঁপে দিয়ে একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে ঘরে বসুক গে। মনে ভাবলাম, আমারও ত বৈকুণ্ঠপুরী শূন্য খাঁ খাঁ করচে—ছেলেটাও মানুষ হচ্ছে না—যাক, এক কাজে দু'কাজ হবে। একটা ব্রাহ্মণের কুল রক্ষাও করা হবে, গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই থাকবে। তাদেরও ত সবেমাত্র ওই মেয়েটি—

কিন্তু কথাটাকে তিনি রাজার ভাবী শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া আর শেষ করিতে পারিলেন না। শুনিতে শুনিতে জগদ্ধাত্রী একেবারে যেন কাঠ হইয়া গিয়াছিলেন।

রাসমণি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, কি হ'লো রে জগো?

জগদ্ধাত্রী নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, না—মাসি, গোলকমামা তোমাকে তামাসা করেচেন।

তামাসা কি লো? এতটা বয়স হ'লো তামাসা কাকে বলে জানিনে? তা ছাড়া ভাই-বোনে তামাসা?

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তামাসা বই কি মাসি। এ কি কখনো হতে পারে?

রাসমণি একটু হাসিলেন, বলিলেন, তা সত্যি বাছা—আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বুঝি-বা স্বপনই দেখচি। কিন্তু পরেই বুঝলুম, না, জেগেই আছি। মেয়েটার অদৃষ্ট বটে! নইলে, কুলীনের মেয়ের ভাগ্যে এ কেউ কখনো দেখেচে না শুনেচে! আশীর্ব্বাদ করি জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাক্, কিন্তু যা—যা বলে দিলুম আজই কর গে বাছা। আর কথাটা না যেন পাঁচ-কান হয়! আগে ভালোয় ভালোয় আশীর্ব্বাদ হয়ে যাক।

জগদ্ধাত্রী বাক্‌শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাসমণি পুনশ্চ কহিলেন, এই সামনের অঘ্রাণের পরেই নাকি এক বচ্ছর অকাল। আমার চাটুয্যেদাদার ইচ্ছেটা—, বলিয়া তিনি একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, আর হবে নাই বা কেন বল্? মেয়ে যে একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমে। দেখলে মুনির মন টলে যায়, তা আবার গোলক চাটুয্যে! বলিয়া সহাস্যে জগদ্ধাত্রীর বাহুর উপর একটু আঙুলের চাপ দিয়া কহিলেন, যাও মা, ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়িয়ো না—আমিও যাই, বেলা হয়ে গেল—ও-বেলা আবার তখন আসব, ঢের কথা আছে।

এই বলিয়া তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

জগদ্ধাত্রী অনেকটা যেন টলিতে টলিতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরঘরের বারান্দার উপর জলপূর্ণ কলসিটাকে ধপ্ করিয়া রাখিয়া দিয়া সিক্ত-বস্ত্রে সেইখানেই বসিয়া পড়িতে তাঁহার দুই চক্ষু তপ্ত অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

তাঁহার ওই একমাত্র সন্তান। তাঁহার বড় আদরের সন্ধ্যা রূপে ও গুণে যথার্থই লক্ষ্মীর প্রতিমা। সেই প্রতিমার বিসর্জ্জনের আহ্বান

আসিল গোলক চাটুয্যের নরক-কুণ্ডে! যে গোলক কন্যার মাতামহের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহারই হাতে সমর্পণ করার চেয়ে যে তাহার মৃত্যু ভাল, এ তাঁহার বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু মুখ দিয়া 'না' কথাটাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেও নাকি ব্রাহ্মণ কুলীনেরই মেয়ে—সমাজে এবং পরিবারে ইহা যে কিছুই বিচিত্র নয়—ইহার চেয়ে বহুতর দুর্গতি নাকি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—তাই নিজের মেয়ের কথা স্মরণ করিয়া অন্তরটা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকিলেও, ইহাকে অসম্ভব বলিয়া নিবাইয়া ফেলিবার এক বিন্দু জল কোনদিকে চাহিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। একাকী বসিয়া নিঃশব্দে কেবলই অশ্রু মুছিতে লাগিলেন, এবং কেবলই মনে হইতে লাগিল, অচির-ভবিষ্যতে হয়ত ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবে—হয়ত এই মানুষটার দুর্জ্জয় বাসনাকে বাধা দিবার কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইবেন না। উহার সেদিনের সকৌতুক রহস্যালাপের কথাগুলাই তাঁহার ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই স্মরণ হইতে লাগিল—তাহার মধ্যে যে এতখানি গরল গোপন ছিল, তখন তাহা কে সন্দেহ করিতে পারিত!

সদরের দরজা দিয়া সন্ধ্যা একখানা চিঠি পড়িতে পড়িতে এক-পা এক-পা করিয়া প্রবেশ করিল। পড়া বোধ হয় তখনও শেষ হয় নাই, কোনদিকে না চাহিয়াই ডাক দিল, মা, মা গো?

জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি চোখ দুটা মুছিয়া সাড়া দিলেন, কেন মা?

তাঁহার ভারি গলার আওয়াজে সন্ধ্যা চমকিয়া মুখ তুলিল, ধীরে ধীরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে মা?

জগদ্ধাত্রী কন্যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিছুই ত হয়নি মা।

সন্ধ্যা আরও নিকটে আসিয়া নিজের অঞ্চলে মায়ের অশ্রুজল

সযত্নে মুছাইয়া দিয়া করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আবার বাবা কি আজ কিছু করেচেন মা?

জগদ্ধাত্রী শুধু বলিলেন, না।

মেয়ে তাহা বিশ্বাস করিল না। আস্তে আস্তে জননীর পাশে বসিয়া কহিল, সংসারে সব জিনিষ মানুষের মনের মত হয় না মা। সবাই ত আমার বাবাকে পাগলা ঠাকুর বলে ডাকে, তুমিও কেন তাঁকে তাই মনে ভাবো না?

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তারা ভাবতে পারে তাদের কোন লোকসান নেই—কিন্তু আমার মত কাউকে ত জ্বালা পোহাতে হয় না সন্ধ্যে।

এই জ্বালা যে কি এবং তাঁহার জন্য কাহাকে যে কোথায় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, ইহা সে কোনদিন ভাবিয়া পাইত না, আজও পাইল না এবং এই তাহার নিরীহ, নির্বিরোধ, পরদুঃখকাতর, অল্পবুদ্ধি পিতার দুঃখে তাহার চিত্ত স্নেহ ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কহিল, আমার যদি সাধ্য থাকত মা, তা হলে বাবাকে নিয়ে আমি বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতে এমন কোথাও চলে যেতেম, পৃথিবীর কাউকে তাঁর জন্যে জ্বালা সইতে হ'তো না।

জগদ্ধাত্রী তাঁহার কন্যার চিবুক হইতে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চুম্বন গ্রহণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, বালাই ষাট! কিন্তু আমি যেন তোর সৎমা। তাঁর অর্দ্ধেকও তুই যদি আমাকে ভালবাসতিস্ সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা কহিল, তোমাকে কি ভালবাসিনে মা?

মা বলিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে তোর যেন সারা প্রাণটা পড়ে আছে—পায়ে কাঁকরটি না ফোটে এমনি তোর ভাব। তুই বেশ জানিস্ তাঁর ওষুধে কিছু হয় না, তবু তুই প্রাণটা দিতে বসেচিস্,

কিন্তু আর কারও ওষুধ খাবিনে—পাছে তাঁর লজ্জা হয়। এ-সব কি আমি টের পাইনে সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, তাই বই কি! বাবার মত ডাক্তার কি কোথাও আছে নাকি!

মা বলিলেন, নেই সে-কথা সত্যি।

সন্ধ্যা রাগ করিয়া বলিল, যাও—তোমাকে ঠাট্টা করতে হবে না। মানুষের অসুখ বুঝি একদিনেই ভাল হয়ে যায়? আমি ত আগের চেয়ে ঢের সেরে উঠেচি।

এই বলিয়াই এ-প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া কহিল, দুলেবৌরা উঠে গেছে মা। বাঁচা গেছে।

কখন্ গেল?

কি জানি! বোধ হয় ভোরে উঠেই চলে গেছে।

তাহার কৃত্রিম ঔদাসীন্য মাকে ভুলাইতে পারিল না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথায় উঠে গেল জানিস্?

সন্ধ্যা তেমনি তাচ্ছিল্যভরে কহিল, অরুণদার ওই পিছনের বাগানটাতে বুঝি। তার উড়েমালীর একটা ভাঙা পোড়ো-ঘর ছিল না? তাতেই বোধ হয়।

জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, অরুণের কাছে কে তাদের পাঠালে? তুই বুঝি?

সন্ধ্যা মনে মনে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কোনমতে সোজা মিথ্যাটা বাঁচাইয়া বলিল, অরুণদার কাছে আমি কেন তাদের পাঠাতে যাবো মা? আমি কাউকে কারুর কাছে পাঠাইনি।

এই বলিয়া সে নিরতিশয় বিশ্রী প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি উল্টাইয়া দিয়া হাতের চিঠিটা মেলিয়া ধরিয়া কহিল, আসল কথাটাই তোমাকে এখনো বলা হয়নি মা। আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা এবার কাশী

থেকে সত্যি-সত্যিই আসবেন লিখেচেন। তিনি ত কখনো মিথ্যা বলেন না মা—এবার বোধ হয় তাঁর দয়া হয়েচে।

জগদ্ধাত্রী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মার চিঠি? কবে আসবেন লিখেচেন?

তাঁহার কাশীবাসিনী সন্ন্যাসিনী শ্বশ্রূ কাশী ছাড়িয়া একটা দিনের জন্যও কোথাও যাইতে চাহিতেন না। এবার জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে অনেক করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার একমাত্র পৌত্রীর বিবাহে তাঁহাকে কেবল উপস্থিত হওয়া নয়, কন্যা দান করিতে হইবে। শাশুড়ী দান করিতে কোনমতেই সম্মত হন নাই, কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন বলিয়া জবাব দিয়াছেন।

সন্ধ্যা নিজের বিবাহের কথায় লজ্জা পাইয়া বলিল, তোমার চিঠির জবাব তুমিই পড় না মা। বলিয়া কাগজখানি মায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া হঠাৎ ব্যগ্র হইয়া কহিল, ও মা, তুমি যে এখন পর্য্যন্ত ভিজে কাপড়েই রয়েচো—যাই তোমার শুক্‌নো কাপড়খানা দৌড়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

জগদ্ধাত্রী চিঠিখানি মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, বৌ ব'লে এতকাল পরে কি সত্যিই দয়া হ'লো মা! বলিয়া তিনিও উঠিয়া ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহার স্বামী অত্যন্ত সোরগোল করিয়া বাড়ী ঢুকিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—দুটো দিন যাইনি, দুটো দিন দেখিনি, অমনি হাইপোকণ্ড্রিয়া ডেভেলপ্ করেচে!

স্বামীর সহিত জগদ্ধাত্রীর বড় একটা কথা হইত না, কিন্তু তাঁহার এই অতি-ব্যস্ততা এবং বিশেষ করিয়া বেলা বারোটার পূর্ব্বে আজ অকস্মাৎ প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া তিনি মনে মনে কিছু বিস্মিত হইলেন। মুখ তুলিয়া শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কি হয়েচে?

প্রিয় কহিলেন, অরুণের। ঠিক হাইপোকণ্ড্রিয়া! আমি যা ডায়াগ্‌নোস্‌ করব, কারুর বাবার সাধ্যি আছে কাটে? কৈ, বিপ্‌নে বলুক ত এর মানে কি?

অন্যসময়ে জগদ্ধাত্রী বোধ হয় আর দ্বিতীয় কথা কহিতেন না, কিন্তু অরুণের নাম শুনিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন, কইলেন, কি হয়েচে অরুণের?

প্রিয় কহিলেন, ঐ ত বললুম গো। বিপ্‌নেই বুঝবে না, তা তুমি! তবু ত সে যা হোক একটু প্র্যাকটিস্‌-ফ্র্যাকটিস্‌ করে। জিনিষ-পত্র বাঁধা হচ্ছে—বাড়ী-ঘর-দোর-জমি-জায়দাদ বিক্রী হবে—হারাণ কুণ্ডুকে খবর দেওয়া হয়েচে—ভাগ্যে গিয়ে পড়লুম! যেদিকে যাবো না, যে-দিকে একদিন নজর রাখব না, অমনি একটা অঘটন ঘটে বসবে! এমন করে আমার প্রাণ বাঁচে না বাপু! সন্ধ্যে? কোথা গেলি আবার? ধাঁ করে মেটিরিয়া-মেডিকাখানা নিয়ে আয় ত মা, একটা রেমিডি সিলেক্ট করে তারে খাইয়ে দিয়ে আসি।

যাই বাবা, বলিয়া সাড়া দিয়া একখানা মোটা বই হাতে সন্ধ্যা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী রাগ করিয়া কহিলেন, পায়ে পড়ি তোমার, খুলেই বল না ছাই কি হয়েচে অরুণের?

প্রিয় চমকিয়া উঠিলেন, তার পরে বলিলেন, আহা, হাইপো—মানসিক ব্যাধি। আজকালের মধ্যেই সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় হারাণ কুণ্ডুকে সমস্ত বেচে দিয়ে। তা হবে না, হবে না—ও-সব হতে আমি দেবো না। একটি ফোঁটা তুশ শক্তির—

সন্ধ্যা বিবর্ণ-নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। জগদ্ধাত্রী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বাড়ী-ঘর বিক্রী করে চলে যাবে অরুণ? সে কি পাগল হয়ে গেল?

প্রিয় হাতখানা সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, উহুঁ তা নয়, তা নয়। নিছক হাইপোকণ্ড্রিয়া। পাগল নয়—তারে বলে ইন্স্যানিটি। তার আলাদা ওষুধ। বিপ্‌নে হলে তাই বলে বসত বটে, কিন্তু—

জগদ্ধাত্রী কটাক্ষে একবার মেয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া লইলেন এবং স্বামীর অনর্গল বক্তৃতা সহসা দৃঢ়কণ্ঠে থামাইয়া দিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তোমার নিজের কথা আমার শোনবার সময় নেই। অরুণ কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে?

প্রিয় বলিলেন, চাইচে! একেবারে ঠিকঠাক। কেবল আমি গিয়ে—

ফের আমি? অরুণ কবে যাবে?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, কবে? আজও যেতে পারে, কালও যেতে পারে, শুধু হারাণ কুণ্ডু ব্যাটা—

জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হারাণ কুণ্ডু সমস্ত কিনবে বলেচে?

প্রিয় বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে ব্যাটা ত কেবল ওই চায়। জলের দামে পেলে—

জগদ্ধাত্রী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, এ-কথা গ্রামের আর কেউ জানে?

প্রিয় বলিলেন, কেউ না, জনপ্রাণী নয়। কেবল আমি ভাগ্যে—

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তোমার ভাগ্যের কথা জানবার আমার সাধ নেই। তুমি শুধু তাকে একবার ডেকে দিতে পারো? বলবে, তোমার খুড়ীমা এখখুনি একবার অতি-অবশ্য ডেকেচেন।

সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহে নাই, নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, এইবার সে চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখ অতিশয় পাণ্ডুর এবং কথা কহিতে গিয়া ওষ্ঠাধরও কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরে সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, কেন মা তাঁকে তুমি বার বার অপমান

করতে চাও? তোমার কাছে তিনি কি এত অপরাধ করেচেন শুনি।

জগদ্ধাত্রী ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, কে তাকে অপমান করতে চাইচে সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা কহিল, না তুমি কখ্‌খনো তাঁকে এ-বাড়ীতে ডেকে পাঠাতে পারবে না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, ডেকে দুটো ভাল কথা বলতেও কি দোষ?

সন্ধ্যা বলিল, ভাল হোক, মন্দ হোক, তিনি থাকুন বা যান, বাড়ী বিক্রী করুন বা না করুন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ যে এ তুমি বলতে যাবে? এ-বাড়ীতে যদি তুমি তাঁকে ডেকে আনো মা, আমি তোমারই দিব্যি করে বলচি, ওই পুকুরের জলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরব! বলিতে বলিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল, জননীর প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র করিল না।

দুঃসহ বিস্ময়ে জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,—কেবল প্রিয়বাবু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা, বইখানা দিয়ে যা না ছাই! বেলা হয়ে গেল, একটা রেমিডি সিলেক্ট করে ফেলি, সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিয়া হাতের বইটা পিতার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ঔষধ-নির্ব্বাচনে মনোনিবেশ করিলেন।

জগদ্ধাত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তুমি মেয়ের বিয়ে কি দেবে না ঠিক করেচ?

প্রিয় কাজ করিতে করিতে বলিলেন, দেবো না? নিশ্চয়ই দেবো।

কবে দেবে? শেষে একটা-কিছু হয়ে গেলে দেবে?

হুঁ।

জগদ্ধাত্রী একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, রসিকপুরে যাও না একবার ?

প্রিয় খোলা পাতার একটা স্থান আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, রসিকপুরে ? কার কি হয়েচে ? কেউ খবর দিয়ে গেছে নাকি ? কখন দিয়ে গেল ?

জগদ্ধাত্রী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জয়রাম মুখুয্যের নাতির সঙ্গে যে বিয়ের একটা কথা হয়েছিল, যাও না, গিয়ে একবার পাত্রটিকে দেখেই এসো না।

প্রিয় কহিলেন, কিন্তু যাই কখন ? দেখলে ত, একটা বেলা না থাকলে কি কাণ্ড হয়ে যায়। অরুণের ওই দশা, আবার চাটুয্যে-মশায়ের ওখান থেকে খবর দিয়ে গেছে তাঁর শালীর নাকি ভারী অসুখ।

জগদ্ধাত্রী কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার. জ্ঞানদার অসুখ ? কি হ'লো আবার তার ?

প্রিয় বলিলেন, অম্বল ! অম্বল ! খাবার দোষে অজীর্ণ রোগ। কেবল গা-বমি-বমি—অরুণের ওখান থেকে ফিরে গিয়ে একটি কৌটাই----

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তাঁদের ওষুধ দেবার ঢের লোক আছে। তোমার পায়ে পড়ি, একবার যাও রসিকপুরে। পাত্রটিকে একবার দেখে এসে যা হোক করে মেয়েটার একটা উপায় কর

গৃহিণীর অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠস্বর বোধ করি প্রিয়নাথকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল। কহিলেন, কিন্তু পাত্রটি যে শুনি ভারী বকাটে ! কেবল নেশা-ভাঙ—

জগদ্ধাত্রী আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, করুক নেশা-ভাঙ, হোক গে বকাটে, তবু মেয়েটা

দু'দিন নোয়া-সিঁদুর পরতে পাবে! তুমি কি? তোমার হাতে আমার বাপ-মা যদি মেয়ে দিতে পেরে থাকেন, তুমিই বা পারবে না কেন? এই বলিয়া তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

প্রিয় অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বই-খানি মুড়িয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দু-দুটো সাঙ্ঘাতিক রুগী হাতে—এমনধারা করলে কি রেমিডি সিলেক্ট করা যায়! বলিয়া পুনশ্চ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বইটা বগলে চাপিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

[গ]

স্নান, পূজাহ্নিক এবং যথাবিহিত সাত্ত্বিক জলযোগাদি সমাপনান্তর মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্যের ন্যায় চাটুয্যেমহাশয় ধীরে ধীরে নীচে অবতরণ করিলেন, এবং বোধ হয় সোজা বাহিরেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের বারান্দাটা ঘুরিয়া ভাঁড়ার-ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ, এ-সব কি হচ্চে বল দিকি ছোটগিন্নী? অসুখ শরীরে গৃহস্থালীর ছাই-পাঁশ খাটুনিগুলো কি না খাটলেই নয়? আমি তাই বলি! আচ্ছা, দেহ আগে না কাজ আগে?

জ্ঞানদা বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতেছিল, কুটিতেই লাগিল। তাঁহার কাষ্ঠ-পাদুকার বিকট খটাখট্ শব্দও যেমন তাহার কানে যায় নাই, তাঁহার উৎকণ্ঠিত অনুযোগও তেমনি যেন তাহার কানে গেল না।

গোলক একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, ব্যাপার কি? আজ সকালে আছো কেমন?

জ্ঞানদা মুখ তুলিল না, হাতের বেগুনটার প্রতি চোখ রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভালো।

গোলক অতিশয় আশ্বস্ত হইলেন, কহিলেন, ভালো, ভালো। আমি জানি কিনা, প্রিয় হোক খ্যাপা পাগলা, কিন্তু ওষুধ দেয় যেন ধন্বন্তরী। কিন্তু যেমন বলে যাবে টাটম-মত খেতে হবে। তাচ্ছিল্য করলে চলবে না তা কিন্তু বলে যাচ্ছি।

জ্ঞানদা এত কথার কোন জবাব দিল না, অধোমুখে কাজ করিতেই লাগিল।

গোলক কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, প্রিয়কে বিশেষ করে বলে দিয়েচি দুটি বেলা এসে দেখে যাবে,—সকালে এসেছিল ত?

জ্ঞানদা তেমনি নত-মুখেই মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

গোলক খুসি হইয়া বলিলেন, আসবে বৈকি! আসবে বৈকি! সে যে আমার ভারী অনুগত। কিন্তু ঝি বেটি গেল কোথায়? সে যাবে ওষুধ দিয়ে, আর তুমি এদিকে খেটে খেটে শরীর পাত করবে, তা আমি হতে দিতে পারব না। বলি, গেল কোথা সব? থাক্ এ-সব পড়ে। যাও ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর গে— মধুসূদন! তুমিই ভরসা! এই বলিয়া গোলক পরের এবং নিজের লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কর্ত্তব্যই আপাততঃ শেষ করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার খড়মের একটুখানি শব্দে চকিত হইয়া এতক্ষণে জ্ঞানদা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখে সেদিনের সেই প্রসন্ন হাসিটুকু আজ নাই, আজ তাহা চিন্তা ও বিষাদের ঘন-মেঘে সমাচ্ছন্ন। চোখ

দুটি আরক্ত, পল্লবপ্রান্তে অশ্রুর আভাস যেন তখনও বিদ্যমান—সেই সজল দৃষ্টি গোলকের মুখের প্রতি স্থির করিয়া অকস্মাৎ গাঢ়-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি প্রিয়বাবুর মেয়ে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চেয়েচো? আমাকে ঠকিয়ো না, সত্যি ব'লো!

গোলক থতমত খাইয়া হঠাৎ জবাব দিতে পারিলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, আমি? সন্ধ্যাকে? নাঃ! কে বললে?

জ্ঞানদা কহিল, যেই বলুক। রাসুদিদিকে তুমি তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলে? সামনের অগ্রাণেই সমস্ত স্থির হয়ে গেছে? ভগবানের দোহাই, সত্যি কথা ব'লো।

গোলক অস্ফুট তর্জ্জনে শাসাইয়া বলিলেন, রাসি-বামনি বলে গেছে? আচ্ছা, দেখচি তাকে! আমি—

জ্ঞানদা বলিয়া উঠিল, কেন তবে তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ করলে? মুখ দেখাবার, দাঁড়াবার যে আর আমার কোথাও স্থান নেই। বলিতে বলিতেই তাহার বিকৃত-কণ্ঠ বুক-ফাটা ক্রন্দনে একেবারে সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল।

গোলক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া হাত তুলিয়া চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন, আহা! কর কি, কর কি! লোকজন শুনতে পাবে যে! মিছে—মিছে—মিছে কথা গো! ঠাট্টা—

জ্ঞানদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, না কখ্খনো ঠাট্টা নয়—কখ্খনো এ মিথ্যে নয়! এ সত্যি! এ সত্যি! তুমি সব পারো। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

না না, বলচি এ ঠাট্টা—তামাসা—নাতনী সুবাদে—আহা হা! চুপ কর না—ঝি-চাকর এসে পড়বে যে! বলিতে বলিতে গোলক খট্ খট্ করিয়া শশব্যস্তে পলায়ন করিলেন।

জ্ঞানদার হাতের বেগুন হাতেই রহিল, সে মুখের মধ্যে অঞ্চল গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন প্রাণপণে নিরোধ করিল।

বাটীর দাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জানাইল, মাসিমা, ঝি সঙ্গে করে কানা দাদামশাই যে স্বয়ং হাজির গো!

জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিল। তাহার সেই অশ্রু-কলুষিত ব্যথিত দৃষ্টির সম্মুখে দাসী বিস্ময়ে লজ্জায় বলিল, তোমাদের সেই পুরোনো ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তোমার শ্বশুরমশাই এসেচেন মাসিমা। কি হয়েচে গো?

খবর শুনিয়া জ্ঞানদার মুখের উপর রক্তের লেশমাত্রও যেন আর রহিল না। মুখোমুখি মৃত্যুকে দেখিয়াও মানুষ বোধ হয় এমন পাণ্ডুর হইয়া যায় না।

দাসী ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েচে মাসিমা?

জ্ঞানদা ইহারও উত্তর দিল না, কেবল বিহ্বল শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দাসী পুনরায় বলিল, তোমার কি কোন অসুখ করেচে মাসিমা?

এতক্ষণে জ্ঞানদা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। বাবা কতক্ষণ এসেচেন কালী?

ঝি বলিল, সে ত জানিনে মাসিমা। এইমাত্র দেখলুম তিনি উঠানে দাঁড়িয়ে বাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

জ্ঞানদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুর সঙ্গে?

ঝি বলিল, হাঁ। আমি বাইরে থেকে আসছিলুম, বাবু ডেকে বলে দিলেন, কালী, তোমার মাসিমাকে খবর দাও গে তাঁর শ্বশুর-মশাই তাঁকে নিতে এসেচেন! ও মা, ঐ যে নিজেই আসচেন। বলিয়াই ঝি একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই লাঠির শব্দে

বুঝা গেল এ লাঠি যাঁর তাঁকে চোখের চেয়ে লাঠির উপরে চলাচলের পথটা অধিক নির্ভর করিতে হয়।

পরক্ষণেই একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠির দ্বারা পথ ঠাহর করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন, আমার মা কোথায় গো?

জ্ঞানদা উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ মানুষ চিনিতে না পারিলেও চেহারাটা দেখিতে পাইলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো-বুড়ীকে এমন করে ভুলে কি করে আছিস্ মা?

যে স্ত্রীলোকটি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, তা সত্যি বৌদিদি। বুড়ী শাশুড়ী মরে—কেবল মুখে তাঁর আমার বৌমাকে নিয়ে এসো—আমার বৌমাকে এনে দাও। কেমন করে এতদিন ভুলে আছো বল ত?

জ্ঞানদা এ অভিযোগের কোন জবাব দিল না। কেবল এক হাতে অশ্রু মুছিতে মুছিতে অন্য হাতে বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বারান্দায় আনিল এবং স্বহস্তে আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, চাটুয্যেমশাইকে দুখানা চিঠি দিলাম, কিন্তু একটারও জবাব পেলাম না। মনে ভাবলাম, তিনি বড়লোক, নানা কাজ তাঁর, আমাদের মত গরীবকে উত্তর দেবার কথা হয়ত তাঁর মনেই নেই; কিন্তু মা ত আমার এই দুঃখীরই ঘরের লক্ষ্মী—

যে দাসী সঙ্গে আসিয়াছিল অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, হলেই বা ভগিনীপতি বড়লোক, তাই বলে ঘরের বৌকে আর কে কতদিন পরের বাড়ী ফেলে রাখতে পারে, বৌদিদি? তা ছাড়া,

যার সেবা করতে আসা, সেই বোনই যখন মারা গেল। আমি বলি—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, থাক্ সদু, ও-সব কথা। বৌমা! তোমার শাশুড়ীঠাকরুণ বড় পীড়িত। আজ দিন ভাল দেখেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন যে, আমার বৌমাকে একবার—

সদু বলিল, বৌদিদি, তোমার জন্যেই বুঝি প্রাণটা তাঁর বেরুচ্চে না। আজ ক'দিন থেকে কেবল বলচেন—সদু, মা আমার, যা তুই একবার এঁকে নিয়ে। এনে একবার দেখা আমার মাকে। বলিতে বলিতে সদুর গলা করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, চাটুয্যেমশাই যে আমার চিঠি দুটো পাননি, তা ত আর আমি জানিনে। আমরা কত কথাই না তোলাপাড়া করছিলাম। বড় ভাল লোক—সাধু ব্যক্তি। শুনেই বললেন, বিলক্ষণ! আপনাদের বৌ আপনারা নিয়ে যাবেন তাতে বাধা দেবে কে? পাল্কী বেহারা বলে দিলেন। তোমার শাশুড়ীর অসুখ শুনে দুঃখ করে বার বার বললে লাগলেন, আমার বড় বিপদের দিনে জ্ঞানদাকে আপনারা পাঠিয়েছিলেন, এখন আপনাদের বিপদের সময় এমন পাষণ্ড সংসারে কে আছে যে তাকে ফিরে পাঠাতে আপত্তি করবে! এখ্খুনি নিয়ে যান, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

জ্ঞানদা এতক্ষণ একেবারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, অকস্মাৎ বিবর্ণমুখে বলিয়া উঠিল, চাটুয্যেমশাই বললেন এই কথা? এখ্খুনি পাঠাবেন? আজই?

সৌদামিনী খুসি হইয়া কহিল, হাঁ—বললেন বই কি। বরঞ্চ এমনও বলে দিলেন যে, খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়লে তিনটের গাড়ী ধরে অনায়াসে কাল সকাল নাগাদ বাড়ী পৌঁছানো যাবে। তা ছাড়া ঘরে মর-মর রুগী, কোথায় কি একটা দিনও দেরী করবার যো

আছে বৌদিদি! আহা! বুড়ী যেন কেবল মা-পিত্যেশ করে তোমার পথ চেয়ে আছে!

জ্ঞানদা কেবল যেন কলের পুতুলের মত তাহার পূর্ব্বে কথাটাই আবৃত্তি করিতে পারিল। কহিল, উনি বললেন পাঠাবেন আজই?

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ মা, আজই বই কি! থাকবার ত যো নেই।

কিন্তু সৌদামিনী বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার কণ্ঠস্বরে তাহা অপ্রকাশও রহিল না। কহিল, শোনো কথা একবার! শাশুড়ী মরে—যার ঘরের বৌ তিনি নিজে এসেচেন নিতে—কে পাঠাবে না শুনি? তা ছাড়া আর থাকাই বা এখানে কিজন্যে? ভালো, তোমার ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞেসা করেই না হয় পাঠাও না বৌদিদি?

কিন্তু পাঠাইতে হইল না। বোধ করি কাছেই কোথাও তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, খট্ খট্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাবটা তাঁহার অত্যন্ত ব্যস্ত। বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, না, মুখুয্যেমশাই, বসে গল্প করলে চলবে না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, স্নানাহ্নিক সেরে আহারাদির পরে একটু বিশ্রাম করে বেরুতেই সময় হয়ে যাবে। ওদিকে আবার বারবেলা পড়বে। বিলক্ষণ! পাঠাতে আপত্তি! আমাদের না হয় একটু কষ্টই হবে, তা বলে—সে কি কথা! শাশুড়ীঠাকরুণের অত-বড় ব্যারাম, আমার যে সহস্র ঝঞ্ঝাট—এতটুকু ফুরসৎ নেই, নইলে যে নিজে গিয়ে জ্ঞানদাকে রেখে আসতাম! চিঠি কি একটাও পেলাম! তা হলে আপনাকে না-কি আবার কষ্ট করে আসতে হয়! পিয়ন বেটারা সব হয়েচে—, কালী কোথায় গেলি? ভুলোকে না হয় এইখানেই বল্ না এক কলকে তামাক দিয়ে যেতে। নিন মুখুয্যেমশাই, আর দেরি নয়, উঠুন। জ্ঞানদা, একটুখানি চট্‌পট্ নাও দিদি—ওদিকে আবার

তিনটের গাড়ী ধরাই চাই। আঃ—চোঙদারটা আবার বাইরে বসে —গিন্নী স্বর্গীয় হওয়া থেকে কি যে মন হয়েচে মুখুয্যেমশাই, কিছু মনেই থাকে না। মধুসূদন! তুমিই ভরসা! তুমিই ভরসা! বলিতে বলিতে গোলক চাটুয্যেমশাই যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে সমস্ত বাড়ীটা খড়মের কঠোর শব্দে মুখরিত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

জ্ঞানদা একটা কথারও জবাব দিল না—কেবল সেইদিকে চাহিয়া পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভুলো আসিয়া কহিল, মাসিমা, খোকাবাবু নাইবার জন্যে কাঁদচে। নদীতে কি নিয়ে যাবো?

জ্ঞানদা তেমনি নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, ভুলোর আবেদন বোধ হয় তাহার কানেও গেল না।

বৃদ্ধ শ্বশুর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, মা, আমি তা হলে বাইরে যাই, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

সদু কহিল, আজ আমার ষষ্ঠী, বৌদিদি, এবেলা ভাত খাবো না বলে দিয়ো।

জ্ঞানদা সহসা ফিরিয়া দাড়াইয়া কহিল, বাবা, আমি যাবো না।

বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, যাবে না? কেন মা, আজ ত বেশ দিন!

সৌদামিনী ষষ্ঠীর ফলার ভুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আমরা যে ভট্‌চাযিমশাইকে দিয়ে দিন ক্ষণ দেখিয়ে তবে বাড়ী থেকে বার হয়েচি বৌদি!

জ্ঞানদা শুধু বলিল, না বাবা, আমি যেতে পারব না।

গোলকের বছর-দশেকের ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে

পড়িয়া বলিল, মাসিমা, তুমি বলে দাও না মাসিমা, আমি যাবোই নদীতে নাইতে—হুঁ—যাবই কিন্তু—

জ্ঞানদা কাহাকেও কিছু কহিল না, কেবল সেই দুর্দ্দান্ত ছেলেটাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হু হু রবে কাঁদিয়া উঠিল।

[ঘ]

তাহার পর জ্ঞানদা সেই যে ঘরে কবাট দিল আর খুলিল না। বৃদ্ধ অন্ধ শ্বশুর সমস্ত দুপুরবেলাটা বিমূঢ় বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সৌদামিনীও গেল। এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের হেতু সেও বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু সে মেয়েমানুষ—অমন করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাওয়া তাহার সাধ্য নয়। যাইবার পূর্ব্বে জ্ঞানদার রুদ্ধ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া যে গুটি-কয়েক কথা বলিয়া গেল তাহা সুন্দরও নয়, মধুরও নয়; কিন্তু কোন কথার কোন জবাব জ্ঞানদা দিল না। এমন কি তাহার একবিন্দু কান্নার শব্দ পর্য্যন্ত সে বাহিরে আসিতে দিল না। ছেলে-বেলা বিধবা হওয়ার দিন হইতে যে শাশুড়ী তাহাকে এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, একটি দিনের জন্য কোন দুঃখ দেন নাই,—আজ তিনি মৃত্যুশয্যায়, কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া তাঁহার দুঃখের জীবন মুক্তি পাইতেছে না, অথচ তাহার অশক্ত অন্ধ শ্বশুর রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিলেন—এ যে কি এবং কি করিয়া যে এই ব্যথা সে তাহার রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে একাকী বহন করিতে লাগিল, সে কেবল জগদীশ্বরই দেখিলেন, বাহিরে তাহার আর কোন সাক্ষ্য রহিল না।

বৃদ্ধের যাইবার সময় গোলক দেখা করিলেন, সবিনয়ে পাথেয়

দিতে চাহিলেন, এবং জ্ঞানদার না যাওয়ার বিস্ময় ও বেদনা তাঁহার বৃদ্ধকেও যেন অতিক্রম করিয়া গেল।

গোলক বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বসিয়া আছে। মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল। গোলক নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন না, ঘাড়টা একটুখানি নাড়িয়া বলিলেন, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম বাবাজী।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আজ্ঞে, শুনেই ত মুখে দুটি ভাত দিয়েই ছুটে আসচি চাটুয্যেমশাই।

গোলক বলিলেন, তা ত আসচো হে—কিন্তু ঘটকালি ত করে বেড়াও, বলি দেশের খবর-টবর কিছু রাখো? হাঁ, ঘটক ছিলেন বটে তোমার পিতামহ রামতারণ শিরোমণি! সমাজটি ছিল নখ-দর্পণে।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আজ্ঞে, আমার অপরাধ কি? এ-সব কি মেয়ে-মানুষের কাজ? কিন্তু, সে যাই হোক—জগো বামুনের মেয়েটার কি আস্পর্দ্ধা বলুন দেখি চাটুয্যেমশাই? রাসুপিসির কাছে শুনে পর্য্যন্ত আমরা যেন রাগে জ্বলে যাচ্ছি।

গোলক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, কি, কি? ব্যাপারটা কি বল দেখি?

আপনি কি কিছু শোনেননি?

না না, কিছু না। হয়েচে কি?

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, আপনারও গৃহ শূন্য, ও মেয়েটারও আর বিয়ে হয় না। শুনলাম আপনি নাকি দয়া করে দুটো ফুল ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের কুলটা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ছুঁড়ি নাকি তেজ করে সকলের সুমুখে বলেচে—কথাটা উচ্চারণ করতেও মুখে বাধে মশাই—বলেচে নাকি, ঘাটের মড়ার গলায় ছেঁড়া-জুতোর মালা গেঁথে পড়িয়ে দেবো! তাঁর মা-বাপও নাকি তাতে সায় দিয়েচে।

রাগে গোলকের চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু একনিমিষে নিজেকে সামলাইয়া, হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, বলেচে না-কি? ছুঁড়ি আচ্ছা ফাজিল ত?

ক্রুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় কহিল, হোক ফাজিল, কিন্তু তাই বলে আপনাকে বলবে এই কথা! জানে না সে আপনার পায়ে মালা দিলে তার ছাপ্পানো-পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে! আপনি বলেন কি?

গোলক প্রশান্ত হাসিমুখে কহিলেন, ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ! রাগ করতে নেই হে মৃত্যুঞ্জয়—রাগ করতে নেই। আমার মর্য্যাদা সে জানবে কি—জানে৷ তোমরা, জানে দশখানা গ্রামের লোক।

মৃত্যুঞ্জয় গলাটা কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি তা হলে সত্যি নয়? আপনি কি তা হলে রাসু-পিসিকে দিয়ে—

গোলক কহিলেন, রাধামাধব! তুমি ত ক্ষেপলে বাবাজী। যার অমন গৃহলক্ষ্মী যায়, সে নাকি আবার—বলিয়া অকস্মাৎ প্রবল নিঃশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

তাঁহার ভক্তি-গদ্‌গদ উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে মৃত্যুঞ্জয় কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

গোলক কয়েক-মুহূর্ত্ত পরে উদাসকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, ছাই-পাশ মনেও পড়ে না কিছু—লোকজনেরা ত দিবারাত্রি খেয়ে ফেললে আমাকে—এঁকে বাঁচান, ওঁকে রক্ষা করুন, অমুকের কুল উদ্ধার করুন,—আমাকে ত জানো চিরকাল অন্যমনস্ক উদাসীন লোক—হয়ত বা মনের ভুলে কাউকে কিছু বলেও থাকব—মধুসূদন! তুমিই ভরসা! তুমিই গতি মুক্তি!

ঘটক মৃত্যুঞ্জয় পাইয়া বসিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে তাই যদি হয়, আমাদের প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়েটিকে আপনাকে পায়ে স্থান

দিতেই হবে। ব্রাহ্মণ গরীব, মেয়েটির বয়সও তের-চোদ্দ হ'লো—কিন্তু যেমন লক্ষ্মী, তেমনি সুরূপা।

গোলক বলিলেন, তুমি পাগল হলে মৃত্যুঞ্জয়! আমার ও-সব সাজে, না ভাল লাগে? তা মেয়েটি বুঝি এরই মধ্যে বছর-চোদ্দ হ'লো? একটু বাড়ন্ত গড়ন বলেই শুনেচি না?

মৃত্যুঞ্জয় উৎসাহিত হইয়া কহিল, আজ্ঞা হাঁ, খুব খুব। তা যেমন শান্ত, তেমনি সুন্দরী।

গোলক মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঃ। আমার আবার সুন্দরী! আমার আবার সুরূপা! যে লক্ষ্মীর প্রতিমে হারালাম! মধুসূদন! কারও দুঃখই সইতে পারিনে, শুনলে দুঃখই হয়। তেরো-চোদ্দ যখন বলচে তখন পনর-ষোল হবেই। ব্রাহ্মণ বড় বিপদেই পড়েচে বল?

মৃত্যুঞ্জয় মাথা নাড়িয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি।

গোলক কহিলেন, বুঝি সমস্তই মৃত্যুঞ্জয়। কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। না রাখলে প্রত্যবায় হয়। কিন্তু একে শোক-তাপের শরীর, বয়সও নয় পঞ্চাশের কাছে ঘেঁসেই আসচে—কিন্তু কি যে স্বভাব, অপরের বিপদ শুনলেই প্রাণটা যেন কেঁদে ওঠে—না বলতে পারিনে।

মৃত্যুঞ্জয় পুনঃ পুনঃ শির সঞ্চালন করিতে লাগিল। গোলক পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই স্বভাব-কুলীনের গ্রামে সমাজের মাথা হওয়া যে কি ঝকমারি তা আমিই জানি। কে খেতে পাচ্ছে না, কে পরতে পাচ্ছে না, কার চিকিৎসা হচ্ছে না—এ-সকল ত আছেই, তার ওপর এই-সব জুলুম হলে ত আমি আর বাঁচিনে মৃত্যুঞ্জয়। প্রাণকৃষ্ণ গরীব, তা মেয়েটি বুঝি বেশ ডাগর হয়ে উঠেচে—তেরো-চোদ্দ নয়, পনর ষোলর কম

হবে না কিছুতেই—তা ব'লো না হয় প্রাণকৃষ্ণকে একবার দেখা করতে—

মৃত্যুঞ্জয় ব্যগ্র হইয়া বলিল, আজই—গিয়েই পাঠিয়ে দেবো, বরঞ্চ সঙ্গে করেই না হয় নিয়ে আসব।

গোলক উদাসকণ্ঠে কহিলেন, এনো; কিন্তু বড় বিপদে ফেললে মৃত্যুঞ্জয়—গরীব ব্রাহ্মণের এ বিপদে না বলবই বা কি করে। মধু-সূদন! ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন! যা করাবেন তাই করতে হবে। আমরা নিমিত্ত বই ত নয়!

মৃত্যুঞ্জয় নীরব হইয়া রহিল।

গোলকের হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, হাঁ ছাখো, তোমাকে যেজন্যে ডেকে পাঠিয়েচি তাই এখনো বলা হয়নি। বলচি, মাসটা বড় টানাটানি চলচে, তোমার সুদের টাকাটা—

মৃত্যুঞ্জয় করুণস্বরে বলিল, এ মাসটা যদি একটু দয়া করে—

গোলক কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে। আমি কষ্ট দিয়ে এক পয়সাও নিতে চাইনে; কিন্তু বাবুজী, তোমাকেও আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয় প্রফুল্ল হইয়া কহিল, যে আজ্ঞে। আজ্ঞা করুন।

গোলক বলিলেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্মটি বাঁচিয়ে সমাজ রক্ষা করে চলা ত সোজা দায়িত্ব নয়, মৃত্যুঞ্জয়। এ মহৎ ভার যার মাথার উপর থাকে, তার সকল দিকে চোখ-কান খুলে রাখতে হয়। শুনেছিলাম প্রিয় মুখুয্যের মায়ের সম্বন্ধে কি একটা নাকি গোল ছিল। এই খবরটি বাবা তোমাকে তাদের গ্রামে গিয়ে অতি গোপনে সংগ্রহ করে আনতে হবে। সে ছিলেন বটে তোমার পিতামহ শিরোমণি মহাশয়, বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের নাড়ীর খবর ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। ভূপতি চাটুয্যের যে দশটি বছর হুঁকো-নাপতে বন্ধ করে দিয়েছিলাম—

ভায়াকে শেষে বাপ্ বাপ্ করে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে হ'লো, সে ত তোমার পিতামহের সাহায্যেই। কিন্তু তোমার বাবা তাঁর কীর্ত্তি বজায় রাখতে পারলে না, এ-কথা আমাকে বলতেই হবে।

মৃত্যুঞ্জয় তাহার পূর্ব্বপুরুষের তুলনায় নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কহিল, আপনি দেখবেন চাটুয্যে-মশাই, আমি একটি হপ্তার মধ্যেই তাদের পেটের খবর টেনে বার করে আনব।

গোলক উৎসাহ দিয়া বলিলেন, তা তুমি পারবে, পারবে। কত বড় বংশের ছেলে! কিন্তু দেখো বাবাজী, এ নিয়ে এখন আর পাঁচ-কান করবার আবশ্যক নেই—কথাটা তোমার আমার মধ্যেই গোপনে থাক্; সমাজের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করতে হলে অনেক বিবেচনার প্রয়োজন। তা দ্যাখো, কেবল সুদ কেন, তোমার আসল টাকাটাও আমি বিবেচনা করে দেখব। কষ্টে পড়েচ, এ কথা যদি আগে জানাতে—

মৃত্যুঞ্জয় পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে,—আমরা আপনার চরণেই ত পড়ে আছি। আমি কালই এর সন্ধানে যাবো, বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

গোলক জিব কাটিয়া কহিলেন, অমন কথা মুখেও এনো না বাবাজী। আমি নিমিত্তমাত্র—তাঁর শ্রীচরণে কীটাণুকীটের ন্যায় পড়ে আছি। এই বলিয়া তিনি উপরের দিকে শিবনেত্র করিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া যাইতেছিল, অন্যমনস্ক গোলক সহসা কহিলেন, আর দ্যাখো, প্রাণকৃষ্ণকে একবার পাঠিয়ে দিতে যেন ভুলো না। ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনে পর্য্যন্ত প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠচে। নারায়ণ! মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

তিন

প্রসিদ্ধ জয়রাম মুখোর দৌহিত্র শ্রীমান্ বীরচন্দ্র বন্দ্যোর সহিতই সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে! আগামী কল্য বরপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, বাড়ীতে তাহার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। অগ্রহায়ণের শেষাশেষি বিবাহ, একটিমাত্র দিন আছে, তাহার পরে দীর্ঘদিনব্যাপী অকাল। এই সূত্রে বহু বৎসর পরে বহু সাধ্যসাধনায় শাশুড়ী কাশী হইতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া প্রদীপের আলোতে জগদ্ধাত্রী মিষ্টান্ন রচনা করিতেছিলেন এবং তাঁহারই অদূরে কম্বলের আসনে বসিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী কালিতারা মালা জপ করিতেছিলেন। শীতের আভাস দিয়াছে, তাঁহার গায়ে একখানি গেরুয়া রঙের লুই, পরিধানে সেই রঙে রঞ্জিত বস্ত্র। পুত্রবধূর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিয়ের বুঝি আর দিন-দশেক বাকি রইল বৌমা?

জগদ্ধাত্রী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, কোথায় দশ দিন মা! এই আজ নিয়ে ন'দিন। কাজটা হয়ে গেলে যেন বাঁচি। এ পোড়া দেশে কিছুই যেন না হলে আর ভরসা হয় না।

শাশুড়ী একটু হাসিয়া কহিলেন, সব দেশেই এই ভয় মা, কেবল তোমাদের গ্রামেই নয়। কিন্তু এতে আশা-ভরসাই বা কি আছে বৌমা, অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা মেয়েকে যখন জলে ফেলেই দিচ্ছ?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন, উত্তর দিলেন না।

শাশুড়ী বলিলেন, প্রিয়র কাছে সমস্ত শুনেচি। আজ সকালে

স্নানের পথে অরুণকেও দেখলাম। এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে তোমার পছন্দ হ'লো না বৌমা?

জগদ্ধাত্রী বিশেষ খুসি হইলেন না, বলিলেন, কিন্তু কেবল পছন্দই ত সব নয় মা?

শাশুড়ী বলিলেন, নয় মানি; কিন্তু ফিরে এসে সন্ধ্যার কাছে তার কথা পেড়ে একটু একটু করে যতটুকু পেলাম তাতেই যেন দুঃখে আমার বুক ফাটতে লাগল। হাঁ বৌমা, মা হয়েও কি এ তোমার চোখে পড়ল না?

চোখে তাহার বহুদিন পড়িয়াছে, কিন্তু স্বীকার করা যে একেবারে অসম্ভব। বরঞ্চ সভয়ে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া চাপা গলায় বলিলেন, কাজ-কর্ম্মের বাড়ী, কেউ যদি এসে পড়ে ত শুনতে পাবে, মা।

শাশুড়ী আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু জগদ্ধাত্রী নিজের কণ্ঠ-স্বরের রুক্ষতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, আচ্ছা মা, তুমি কি করে এমন কথা বল? তোমার এতবড় কুলের মর্য্যাদা ভাসিয়ে দিয়ে কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাবে বল ত? তা ছাড়া, তার ত জাতও নেই। যারা তার হয়ে তোমার কাছে ওকালতি করেচে, এ-কথাটা কি তোমাকে তারা বলেচে?

জগদ্ধাত্রী মনে করিলেন, ইহার পরে আর কাহারও বলিবার কিছু থাকিতেই পারে না; কিন্তু শাশুড়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বলেচে বৈ-কি। কিন্তু তার কিছুই যায়নি বৌমা, সমস্তই বজায় আছে। কেবল তার বিদ্যা-বুদ্ধির জন্যেই বলচিনে। জাতিজাত বলে যে অনাথা মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, সে তাদেরই বুকে তুলে নিলে। তার জাত ভগবানের বরে অমর হয়ে গেছে বৌমা, তাকে আর মানুষ মারতে পারে না।

জগদ্ধাত্রী মনে মনে কুপিত হইয়া বলিলেন, অনাথা বলেই কি

হাড়ি-দুলে হয়ে বামুনের ভিটে-বাড়ীতে বাস করবে মা? এই কি শাস্তরে বলে?

শাশুড়ী বলিলেন, শাস্তরে কি বলে তা ঠিক জানিনে বৌমা— কিন্তু নিজের ব্যথা যে কত তা ত ঠিক জানি। আমার কথা কাউকে বলবার নয়, কিন্তু এ-ব্যথা যদি পেতে, ত বুঝতে বৌমা, ছোট-জাত বলে মানুষকে ঘৃণা করার শাস্তি ভগবান প্রতিনিয়ত কোথা দিয়ে দিচ্ছেন। এই যে কুলের মর্য্যাদা, এ যে কতবড় পাপ, কতবড় ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমন করে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর দুটো মানুষের সমস্ত জীবনের সুখ-দুঃখ কি এতবড়ই মিথ্যে মা?

জগদ্ধাত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, তা হলে কি এই মিথ্যে নিয়েই পৃথিবী চলচে মা?

শাশুড়ী একটু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, পৃথিবী ত চলে না বৌমা, চলে কেবল আমাদের অভিশপ্ত জাতের। আমি বিদেশে থাকি, অনেক বয়স হ'লো, অনেক দেখলাম, অনেক দুঃখ পেলাম—আমি জানি যাকে বংশের মর্য্যাদা বলে ভাবচো, যথার্থ সে কি। কিন্তু কথাটা তোমাকে খুলে বলতেও পারব না, হয়ত বুঝতেও তুমি পারবে না। তবুও এই কথাটা আমার মনে রেখো মা, মিথ্যাকে মর্য্যাদা দিয়ে যত উঁচু করে রাখবে, তার মধ্যে তত গ্লানি, তত পঙ্ক, তত অনাচার জমা হয়ে উঠতে থাকবে। উঠচেও তাই।

জগদ্ধাত্রী কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মেয়েকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন। সন্ধ্যা খিড়কির বাগানে এতক্ষণ তাহার ফুলগাছে জল দিতেছিল, বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া হাতের ঘটিটা প্রাঙ্গণের চাতালের উপর রাখিয়া দিয়া, সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মায়ের প্রতি চাহিয়া কহিল, ও-কি মা? চন্দ্রপুলি বুঝি?

বলিয়া হঠাৎ পিতামহীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ঠাকুরমা, সকলের নাড়ু আছে, আমাদের নাই কেন?

কালিতারা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, তা ত জানিনে দিদি।

সন্ধ্যা বলিল, বাঃ—তোমার শাশুড়ীকে বুঝি এ-কথা জিজ্ঞাসা করোনি।

কালিতারা বলিলেন, কি করে আর জিজ্ঞেসা করব ভাই, জন্মে ত কোনদিন শ্বশুরবাড়ীর মুখ দেখিনি।

জগদ্ধাত্রী ইহা জানিতেন, তিনি লজ্জিত-মুখে নীরবে কাজ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠাকুরমা, তোমার সবশুদ্ধ কতগুলি সতীন ছিল? একশ? দুশ? তিনশ? চারশ?

ঠাকুরমা পুনরায় হাসিলেন—ঠিক জানিনে দিদি, কিন্তু অসম্ভবও নয়। আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছর বয়সে, তখনই তাঁর পরিবার ছিল ছিয়াশিটি। তার পরেও অনেক বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু কত সে বোধ হয় তিনি নিজেও জানতেন না, তা আমি জানব কি করে?

সন্ধ্যা বলিল, আহা, তাঁর লেখা ত ছিল? সেই খাতাখানা যদি কেড়ে রাখতে ঠাকুরমা, তা হলে বাবাকে দিয়ে আমি খোঁজ করাতুম তাঁরা সব এখন কে কোথায় আছেন। হয়ত আমার কত কাকা, কত জ্যাঠামশাই, কত ভাই-বোন সব আছেন, না ঠাকুরমা? আহা, তাঁদের যদি সব জানতে পারা যেতো!

একটুখানি হাসিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠাকুরমা, ঠাকুর্দামশাই কালে-ভদ্রে কখনো এলে তাঁকে ক'টাকা দিতে হ'তো? দর-দস্তুর নিয়ে তোমাদের সঙ্গে বুঝি ঝগড়া বেধে যেতো—না?

জগদ্ধাত্রী রাগ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, জ্যাঠামি রেখে ঠাকুরের শেতলের জোগাড়টা সেরে ফেল্ দিকি, সন্ধ্যে।

ঠাকুরমা নিজেও একটু হাসিয়া বলিলেন, সমস্তই ত জানো দিদি, কিন্তু তবু ত তোমাদের মোহ কাটে না ?

এইসকল বিরুদ্ধ সমালোচনা জগদ্ধাত্রীর গোড়া হইতেই ভাল লাগিতেছিল না এবং মনে মনে তিনি বিরক্তও কম হইতেছিলেন না। শাশুড়ীর কথার উত্তরে বলিলেন, তখনকার দিনের কথা জানিনে মা, কিন্তু এখন অত বিয়েও কেউ করে না, ও-সব অত্যাচারও আর নেই। আর জন-কতক লোক যদি একসময়ে অন্যায় করেই থাকে, তাই বলে কি বংশের সম্মান কেউ ছেড়ে দেয় মা ? আমি বেঁচে থাকতে ত সে হবে না।

গৃহস্বামিনী পুত্রবধূর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী নীরব হইলেন, কিন্তু সন্ধ্যা ব্যথিত হইয়া উঠিল : সে পিতামহীর আর একটু কাছে গিয়া কোমল-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেন তাঁরা অমন অত্যাচার করতেন ঠাকুরমা ? তাঁদের কি মায়াও হ'তো না ?

ঠাকুরমা সন্ধ্যার হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে টানিয়া লইয়া বলিলেন, মায়া কি করে হবে দিদি ? একটি রাত ছাড়া যার সঙ্গে আর জীবনে হয়ত কখনো দেখা হবে না, তার জন্যে কি কারও প্রাণ কাঁদে ? আর সে অত্যাচার কি আজই থেমে গেছে ? তোমার ওপরে যা হতে যাচ্ছে সে কি কারও চেয়ে কম অত্যাচার দিদি ?

জগদ্ধাত্রী হাতের কাজ রাখিয়া দিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কঠোর-স্বরে মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুই ঠাকুর-ঘরে যাবি, না আমি কাজ-কর্ম্ম ফেলে রেখে উঠে যাবো, সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা মায়ের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কথাও কহিল না, উঠিবারও চেষ্টা করিল না। ধীরে ধীরে পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যে জিনিষটার এত সম্মান—এতদিন ধরে এমনভাবে চলে আসচে ঠাকুরমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াই ভালো ?

এবার শাশুড়ীও বধূর রুক্ষ কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না। নাতিনীর প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, কিছু একটা দীর্ঘদিন ধরে কেবল চলে আসচে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না দিদি, সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে বিচার করে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সে-ই মরে। আমার সকল কথা কাউকে বলবার নয় ভাই, কিন্তু এ নিয়ে সমস্ত জীবনটাই নাকি আমাকে অহরহ বিষের জ্বালা সইতে হয়েচে। বলিতে বলিতে তাঁহার গলা যেন ভিতরের অব্যক্ত যাতনায় বুজিয়া আসিল।

সন্ধ্যা তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, থাক্ গে ঠাকুরমা এ-সব কথা।

তিনি অন্য হাত দিয়া পৌত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে আপনাকে আপনি একমুহূর্ত্তেই সম্বরণ করিয়া ফেলিলেন, তার পর সহজকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সন্ধ্যা, দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধরেই ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তার পরে আবার এমন দুর্দ্দিনও এসেছিল যেদিন এই দেশেরই রাজার আদেশে তাঁদেরই বংশধরদের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবদ্ধ করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রুটি এবং অনাচারের উপর, তার ভিতরের মিথ্যেটা যদি জানতে দিদি, তা হলে আজ যে বস্তু তোমাদের এত মুগ্ধ করে রেখেচে, শুধু কেবল সেই কুল নয়—ছোট-জাত বলে যে ছেলে-মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, তাদেরও ছোট বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হ'তো।

জগদ্ধাত্রী ক্রোধ এবং বিরক্তি আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু সন্ধ্যা চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার সত্যবাদিনী সন্ন্যাসিনী পিতামহী

ভিতরের কি একটা অত্যন্ত লজ্জা ও ব্যথার ইতিহাস কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার বুক ফাটিতেছে। তাহার হঠাৎ মনে হইল, তাহার পিতামহের বহু-বিবাহের সহিত ইহার কি যেন একটা ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সে সলজ্জে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি ঠাকুরমা, আমাদের মধ্যে খুব বেশি অনাচার প্রবেশ করেচে? যা নিয়ে আমরা এত গর্ব্ব করি তার কি অনেক-খানিই ভুয়ো?

পিতামহী কহিলেন, এর যে কতখানি ভুয়ো সে যে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না! কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিতেও যে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও সন্ধ্যার অবিদিত রহিল না। তিনি হাত দিয়া চোখ-দুটি মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কিন্তু এখন আমি মাঝে মাঝে কি মনে করি জানিস্ সন্ধ্যা? মানুষে মানুষে ব্যবধানের এই যে মানুষের হাতে-গড়া গণ্ডী, এ কখনো ভগবানের নিয়ম নয়। তাঁর প্রকাশ্য মিলনের মুক্ত সিংহদ্বারে মানুষে যতই কাঁটার উপর কাঁটা চাপায়, ততই গোপন গহ্বরে তার অত্যা-চারের বেড়া অনাচারে শতচ্ছিদ্র হতে থাকে। তাদের মধ্যে দিয়ে তখন পাপ আর আবর্জ্জনাই কেবল লুকিয়ে প্রবেশ করে।

অতঃপর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার নিশ্চয় মনে হইতে লাগিল, ইহার সহিত তাহার পিতামহের বহু-বিবাহের সত্যই কি একটা কদর্য্য সম্বন্ধ আছে এবং কিছু না বুঝিয়াও তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, যাও দিদি, ঠাকুর-ঘরের কাজটি সেরে ফেলো গে, নইলে তোমার মা বড় রাগ করবেন।

সন্ধ্যা অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, তিনি নিজেই করে নেবেন

এখন। বলিয়াই সে তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, চল না ঠাকুরমা, আমার ঘরে গিয়ে একটু সেকালের গল্প করবে।

এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

[খ]

রাত্রি খুব বেশি হয় নাই, বোধ হয় একপ্রকার হইয়া থাকিবে, কিন্তু শীতের দিনের পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে অত্যন্ত গভীর মনে হইতেছিল। জ্ঞানদার শয়ন-কক্ষের এককোণে একটা মাটির প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ঘরের মেজেয় বসিয়া জ্ঞানদা এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাসমণি হাত-মুখ নাড়িয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন, কথা শোন্ জ্ঞানদা, পাগলামি করিস্‌নে। ওষুধটুকু দিয়ে গেছে— খেয়ে ফ্যাল্! আবার যেমন ছিল সব তেমনি হবে, কেউ জানতেও পারবে না।

জ্ঞানদা অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে বলিল, এমন কথা আমাকে তোমরা কেমন করে বল দিদি? পাপের উপর এতবড় পাপ আমি কি করে করব? নরকেও যে আমার জায়গা হবে না!

রাসমণি ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, আর এতবড় কাল কালি দিয়েই বুঝি তুমি স্বর্গে যাবে ভেবেচ? যা রয়-সয় তাই কর্ জ্ঞানদা, আদিখ্যেতা করে এতবড় একটা দেশপূজ্যি লোকের মাথা হেঁট করে দিস্‌নে।

জ্ঞানদা হাতজোড় করিয়া কাঁদিয়া বলিল, ও আমি কিছুতে খেতে

পারব না—আমাকে বিষ দিয়ে তোমরা মেরে ফেলবে, আমি টের পেয়েচি।

রাসমণি মুখখানা অতিশয় বিকৃত করিয়া কহিলেন, তবে, তাই বল্ মরবার ভয়ে খাবো না! মিছে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিস্নে।

জ্ঞানদা কহিল, কিন্তু ও যে বিষ।

রাসমণি বলিলেন, বিষ তা তোর কি? তুই তো আর মরচিস্ নে! বলিয়াই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর চক্ষের নিমিষে কোমল ও করুণ করিয়া কহিলেন, পাগলী আর বলে কাকে! আমরা কি তোকে খারাপ জিনিষ খেতে বলতে পারি বোন? এ কি কখনো হয়? রাসি বামনীকে এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তা নয় দিদি—কপালের দোষে যে শত্রুটা তোর পেটে জন্মেচে, সেই আপদ-বালাইটা ঘুচে যাক্—কতক্ষণেরই বা মামলা—তার পরে যা ছিলি তাই হ—খা দা, ঘুরে বেড়া, তীর্থ-ধর্ম্ম বার-ব্রত কর্—এ-কথা কে ই বা জানবে, আর কে-ই বা শুনবে!

জ্ঞানদা অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে আনতে বলে দি বোন?

জ্ঞানদা মুখ তুলিল না, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, না, আমি ও-সব কিছুতে খাবো না—আমি কখ্খনো তা হলে আর বাঁচব না।

রাসমণি ভয়ানক রাগ করিয়া বলিলেন, এ ত তোর ভারি ছিষ্টি-ছাড়া অন্যায় জ্ঞানদা? খেতে না চাস্, যা এখান থেকে। পুরুষ-মানুষ, একটা অ-কাজ না নয় করেই ফেলেচে, তা বলে মেয়েমানুষের এমন জিদ ধরলে ত চলে না। চাটুয্যেদাদা ত বলচেন, বেশ, যা হবার হয়েচে, ওকে আমি পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি, ও কাশী-বৃন্দাবনে চলে যাক। তার পরে ত তাঁকে আর দোষ দিতে পারিনে জ্ঞানদা? টাকাটাও ত কম নয়? একসঙ্গে একমুঠো!

জ্ঞানদা কহিল, আমি টাকা চাইনে দিদি, টাকা দিয়ে আমি কি করব? আমি যে কাউকে কোথাও চিনিনে—আমি কেমন করে কার কাছে গিয়ে এ-মুখ নিয়ে দাঁড়াব?

রাসমণি বলিলেন, এ তোমার জব্দ করার মতলব নয় জ্ঞানদা? লোকে কথায় বলেচে কাশী-বৃন্দাবন! এত লোকের স্থান হয়, আর তোমারই হবে না?

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, রাসুদিদি, আমি সব জানি। কাল ওঁর প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে, তাও জানি। আজ তাই আমাকে বিষ দিয়ে হোক, কাশীতে পাঠিয়ে হোক, বাড়ী থেকে দূর করা চাই। কিন্তু ভগবান! বলিতে বলিতে সে সহসা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কহিতে লাগিল, ভগবান! তোমার পায়ে এত লোকের যখন স্থান হয়, তখন আমারও হবে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে কখনো কোন পাপ করিনি, হয়ত কখনো করতেও হ'তো না—কিন্তু তুমি ত সব জানো? এর সমস্ত শাস্তির বোঝা কি কেবল নিরুপায় বলে আমার মাথাতেই তুলে দেবে?

ভগবানের নামে রাসমণির বোধ করি বিরক্তির অবধি রহিল না, তিনি ধমক দিয়া বলিলেন, আ-মর্! শাপমন্যি দিস কেন? কচি খুকি! চোখ মরে সাত বাড়া জড়িয়ে—এ হয়েচে নাই—তুমি আস্কারা না দিলে পুরুষমানুষের দোষ কি! কই বলুক ত দেখি এমন ব্যাটাছেলে কে আছে রাসি বামনীকে—

ইহার আর উত্তর কি? জ্ঞানদা নীরবে অঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল। রাসমণি অপেক্ষাকৃত শান্ত-গলায় বলিলেন, বেশ ত জ্ঞানদা, ক্যাওরা-বৌয়ের ওষুধ খেতে যদি তোমার ভয় হয়, প্রিয় মুখুয্যেকে ত বিশ্বেস হয়? সেই না হয় একটা কিছু দেবে যাতে—

জ্ঞানদা অবাক্ হইয়া বলিল, তিনি দেবেন?

রাসমণি বলিলেন, হুঁ! দেবে না আবার! চাটুয্যেদাদা বললে দিতে পথ পাবে না। খবর দেওয়া হয়েচে, এসে পড়ল বলে। তখন কিন্তু না বললে আর হবে না বলে দিচ্ছি।

জ্ঞানদা চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল; রাসমণি অধিকতর উৎসাহ-জনক আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অদূরে প্রাঙ্গণে জুতার শব্দ ও মুখুয্যের গলা শোনা গেল—

আঃ! এখানে একটা আলো দেয় না যে কেন? লোকজন সব গেল কোথায়? বলিতে বলিতে খট্ খট্ করিয়া তিনি ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বগলে চাপা ছোট-বড় চার-পাঁচখানা বই তক্ত-পোষের উপর এবং হাতের বাক্সটা নীচে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, আজ কেমন আছো জ্ঞানদা? উঁহু—ও চলবে না, ও চলবে না—ঠাণ্ডা পড়েচে, মাটিতে বসা চলবে না—রেমিডিটা একটু পালটে দিতে হ'লো দেখচি! এ কে, মাসি যে! কতক্ষণ? ভাল ত সব? তোমার নাতনীকে কাল রাস্তায় দেখলাম—তেমন ভাল বলে ত মনে হ'লো না? ক্ষিদে কেমন? কাল নিয়ে গিয়ে তার জিবটা একবার দেখিয়ো দিকি। মরবার ফুরসৎ নেই, কোন্‌দিকে যে যাই! যে-দিকে নজর না রাখব অমনি--কাল মেয়েটার বিয়ে—মাসি, কাল কিন্তু সকালবেলাতেই যাওয়া চাই। মেয়ের বিয়ে, কাল কিছু আর বা'র হতে পারব না—কিন্তু রুগীগুলোর কি যে হবে তাই কেবলি ভাবচি। একটা ত নয়! এমনি হয়েচে যে প্রিয় মুখুয্যেকে ছেড়ে কেউ আর বিপ্‌নেকে ডাকতেই চায় না। তারই বা চলে কি করে? দুঃখও হয়, তবু যা হোক একটু শিখেচে ত! দাও হাতটা একবার দেখি। পঞ্চা গয়লার শুনলাম বুকে সর্দ্দি বসে গেছে—খপ্ করে একবার দেখে আসতে হবে। দাও হাতটা একবার—

জ্ঞানদা হাত বাড়াইয়া দিল না, নীরবে নত-মুখে বসিয়া রহিল।

রাসমণি বলিলেন, ছুঁড়ির ব্যারামটা কি ঠাওরালে বল দিকি জামাই?

প্রিয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ডিস্— গরহজম— অজীর্ণ—অম্বল! অম্বল!

কিন্তু প্রশ্নকারিণীর মৃদু মৃদু শিরশ্চালনা দেখিয়া তাঁহার ডাক্তারি বিদ্যা একেবারে নিবিবার উপক্রম করিল। ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, কেন, কেন? নয় কেন? বিপ্‌নে এসেছিল বুঝি? কি বললে সে? কৈ, দেখি, কি ওষুধ দিয়ে গেল?

রাসমণির মুখে সত্য-মিথ্যা, উগ্র-কোমল, ভাল-মন্দ কিছুই বাধে না, ভূমিকা করিয়া কথা কহিবার প্রয়োজন তাঁহার দৈবাৎ ঘটে—কিন্তু তবুও, তাঁহাকেও আজ সাবধান হইতে হইল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, বিপিন ডাক্তারকে ডাকা হয়নি, পরাণ চাটুয্যেও আসেনি—তোমার কাছে কি আবার তারা? ডাক্তারির তারা জানে কি? এ-কথা চাটুয্যেদাদা যে সকলের কাছে বলে বেড়ায়।

বলবে না? এ যে সবাই বলবে। বিপ্‌নেকে যে আমি দশ বছর শেখাতে পারি। সেবার পলসেটিলা দিয়ে—

মাসি বলিলেন, তা ছাড়া ছুঁড়ি এমন কাণ্ড করে বসলো বাবা যে, আপনার লোক ছাড়া পরকে ডাকবার পর্য্যন্ত যো নেই।

প্রিয় উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন, আমি থাকতে পর ঢুকবে এখানে ডাক্তারি করতে! তবে কি জানো মাসি, এ-সব রোগে একটু টাইম লাগে—কিন্তু তায় বলে যাচ্ছি, দুটির বেশি তিনটি রেমিডি আমি দেবো না। কেমন জ্ঞানদা, গা-বমিটা আমার দুটি ফোঁটা ওষুধে থামল কি না? ঠিক ব'লো?

জ্ঞানদার আনত শির একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে

চাহিল। তাহার হইয়া রাসমণি বলিলেন, তোমাকে ছাড়া ও আর কাউকে বিশ্বাস করে না বাবা, তোমার ওষুধ যেন ওর ধন্বন্তরী। কিন্তু ব্যামোটা যে তা নয় পিওনাথ। অদিষ্টের ফেরে পোড়া কপালীর অসুখটা যে হয়ে দাঁড়িয়েচে উল্টো!

প্রিয় হাতটা তুলিয়া কহিলেন, উল্টো নয় মাসি, উল্টো নয়। বিপ্‌নে মিত্তিরের হাতে পড়লে তাই হয়ে দাঁড়াতো বটে; কিন্তু কিছু ভয় নেই, এ প্রিয় মুখুয্যে।

রাসমণি ললাটে একটুখানি করাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি বাঁচাও ত ভয় নেই সত্যি, কিন্তু সর্ব্বনাশী যে এদিকে সর্ব্বনাশ করে বসেচে! এখন তার মত একটু ওষুধ দিয়ে উদ্ধার না করলে যে কুলে কালি পড়বার যো হ'লো বাবা।

কিন্তু এতবড় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেও তাঁহার শেষ কথাটা যে বেশ প্রাঞ্জল হইয়া উঠিল না, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া মাসি চক্ষের নিমিষে অনুভব করিলেন এবং ইহাই যথেষ্ট পরিস্ফুট করিতে প্রিয়নাথকে তিনি ঘরের একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে গুটিকয়েক কথা বলিতেই সে চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, বল কি মাসি? জ্ঞানদা—?

মাসি কহিলেন, কি আর বলব বাবা, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল? এখন দাও একটু ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলক চাটুয্যের উঁচু মাথা না নীচু হয়! একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি! পুরুষমানুষ—তার দোষ কি বাবা? কিন্তু তার ঘরে এসে তুই ছুঁড়ি কি ঢলাঢলিটা করলি বল্ দিকি!

প্রিয়র মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার জ্ঞানদার মুখখানা তিনি দেখিবার চেষ্টা করিলেন, তার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, তোমরা বরঞ্চ বিপিন ডাক্তারকে খবর দাও মাসি, এ-সব ওষুধ আমার

কাছে নেই। বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া নিজের বাক্সটা এবং বইগুলো সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাসমণি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, বল কি প্রিয়নাথ, আর কি পাঁচ-কান করা যায়? হাজার হোক তুমি আপনার জন, আর বিপিন ডাক্তার পর—শূদ্দুর—বামুনের মান-মর্য্যাদা কি তারে বলা যায়?

কিন্তু বলিবার পূর্ব্বেই সহসা দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে গোলক প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়র বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, বিষের ভয়ে ও যে আর কারও ওষুধ খেতে চায় না বাবা, নইলে কষ্ট তোমাকে দিতাম না। এ বিপদটি তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে প্রিয়নাথ।

প্রিয় হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, না না, ও সব নোঙরা কাজের মধ্যে আমি নেই। আমি রুগী দেখি, রেমিডি সিলেক্ট করি, ব্যস্! বিপিন-টিপিনকে ডেকে পরামর্শ করুন—আমি ও সব জানিনে। বলিয়া আর একবার তিনি বইগুলা বগলে চাপিবার আয়োজন করিলেন।

গোলক সেই হাতটা তাহার আর একবার নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় কহিতে লাগিলেন, প্রিয়নাথ, বুড়োমানুষের কথাটা রাখো বাবা। সম্পর্কে তোমার আমি শ্বশুরই হই—রাখবে না জানলে যে তোমাকে আমরা বলতাম না। দোহাই বাবা, একটা উপায় করে দাও—হাত ধরচি তোমার—

প্রিয়নাথ হাতটা পুনরায় ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, সম্পর্কে শ্বশুর হ'ন বলে কি আপনার কথায় জীবহত্যা করব? আচ্ছা লোক ত আপনি! পরলোকে জবাব দেবো কি?

গোলক দ্বারের কাছে সরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের চেহারা, চোখের ভাব, গলার স্বর সমস্তই যেন অদ্ভুত যাদুবলে একনিমিষে

পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কর্কশ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতরে ঢুকেচ কেন? এখানে তোমার কি দরকার?

প্রশ্ন শুনিয়া প্রিয়নাথ শুধু আশ্চর্য্য নয়, হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; বলিলেন, কি দরকার? বাঃ—বেশ ত! চিকিৎসা করতে কে ডেকে পাঠালে? বাঃ—

গোলক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বাঃ—? চিকিৎসার তুই কি জানিস্ হারামজাদা নচ্ছার। কে তোকে ডেকেচে? কোথা দিয়ে বাড়ী ঢুকলি? খিড়কির দরজা কে তোকে খুলে দিলে?

জ্ঞানদার প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, হারামজাদী! তাই অন্ধ শ্বশুর কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল, যাওয়া হ'লো না? বুড়ো শাশুড়ী মরে— আমি নিজে কত বললুম, জ্ঞানদা যাও, এ-সময়ে তাঁর সেবা কর গে। কিছুতে গেলিনি এইজন্যে? রাত-দুপুরে চিকিচ্ছে করবার জন্যে? দাঁড়া হারামজাদী, কাল যদি না তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রামের বার করে দিই ত আমার নাম গোলক চাটুয্যেই নয়।

জ্ঞানদার মাথায় কাপড় নাই—কখন পড়িয়া গেছে জানিতেই পারে নাই—মুখেও কথা নাই, কেবল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে যেন একেবারে পাথর হইয়া রহিল।

গোলক রাসমণির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, রাস্থ, চোখে দেখলি ত এদের কাণ্ড? আমি দশখানা গ্রামের সমাজের কর্ত্তা, আমার বাড়ীতে পাপ? এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হ'লো রে!

রাসমণি নিজেও এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, হ'লোই ত দাদা!

গোলক কহিলেন, কিন্তু সাক্ষী রইলি তুই।

রাসমণি কহিলেন, রইলুম বই কি। আমি বলি, রাত্তিরে ত

একটু হাত আজাড় হ'লো—দেখে আসি জ্ঞানদা কেমন আছে, দেখি না, বেশ তুটিতে বসে বসে হাসি-তামাসা খোস-গল্প হচ্ছে।

জ্ঞানদা ইহার কোন উত্তর দিল না, তেমনি প্রসারিত-চক্ষে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল।

প্রিয় আচ্ছন্ন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়াছিলেন, গোলক ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে বইগুলো কাড়িয়া লইয়া তাঁহার গলায় সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, বেরো ব্যাটা পাজি নচ্ছার আমার বাড়ী থেকে! কি বলব তুই রামতনু বাঁড়ুয়ের জামাই, নইলে জুতিয়ে আজ আধ-মরা করে তোকে থানায় চালান দিতাম! বলিয়া পুনশ্চ একটা ধাক্কা দিলেন এবং যে চাকর-দাসারা গোলযোগ শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদেরই মধ্য দিয়া তাঁহাকে বারংবার ঠেলিতে ঠেলিতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন।

প্রিয় বলিতে বলিতে গেলেন, বাঃ—বেশ মজা ত!

চাকর-দাসীরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং রাসমণিও নীরবে তাহাদেরই পিছনে পিছনে নিঃসাড়ায় সরিয়া পড়িলেন।

রহিল কেবল জ্ঞানদা—তেমনি নিশ্চল, তেমনি বাক্যহীন, তেমনি অচেতন মূর্ত্তির মত বসিয়া।

[গ]

আজ সমস্তদিন ধরিয়াই কাছে ও দূর হইতে সানাইয়ের করুণ সুর মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল। অগ্রাণের আজিকার দিনটি ছাড়া অনেকদিন পর্য্যন্ত বিবাহের দিন নাই; তাই বোধ হয় এই

ছোট গ্রামখানির মধ্যেই প্রায় চার-পাঁচটা বাড়ীতে শুভ-বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে। আজ সন্ধ্যার বিবাহ।

নানা কারণে অরুণ এখন পর্য্যন্ত বাসস্থান ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে নাই। পূর্ব্বের মত আবার সে কাজ-কর্ম্মও সুরু করিয়াছে—বাহির হইতে জীবনে তাহার কোন পরিবর্ত্তনও দেখা যায় না; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইতে পারিত যে, দেশের প্রতি মমতাবোধটা তাহার যেন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, তাহারা যেন তেমনি দূরে সরিয়া গিয়াছে। গ্রামে সে 'একঘরে', এতগুলা বিবাহ-বাটীর কোনটা হইতেই তাহার নিমন্ত্রণ ছিল না—সামাজিকতা রাখিতে তাহার কোথাও যাইবার নাই—আজ সকল বাটীর দরজাই তাহার কাছে রুদ্ধ।

সন্ধ্যার পর হইতে তাহার দোতলায় পড়িবার ঘরটিতে সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। শীতের হাওয়া বহিতেছে, কিন্তু তবুও ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করা হয় নাই, সব কয়টাই খোলা খাঁ খাঁ করিতে-ছিল। নির্ম্মেঘ নির্ম্মল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় ভাসিয়া যাইতেছে—তাহারই একটুকরা পিছনের মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সম্মুখের খোলা বারান্দার অদূরে একটা ছোট নারিকেলবৃক্ষের মাথার উপর পাতায়-পাতায় জ্যোৎস্নার আলোক পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, সে তাহার প্রতি অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রাতুরের ন্যায় চাহিয়া কি যে ভাবিতেছিল তাহার কোন ঠিকানা ছিল না। পাচক আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে ক্ষুধা নাই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল এবং দেওয়ালে একটা

অন্ধকার স্থান হইতে ঘড়িতে এগারোটা বাজিয়া তাহার শোবার সময়টা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আজ তাহার নড়িবার ইচ্ছাই হইল না, যেমন ছিল তেমনি নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার কানে সদর-দরজায় করাঘাতের আওয়াজ এবং পরক্ষণে তাহা খোলার শব্দও শুনিতে পাইল। একবার ইচ্ছা করিল ডাকিয়া হেতু জিজ্ঞাসা করে, কারণ পল্লীগ্রামে এত রাতে সহজে কেহ কাহারও বাটীতে যায় না, কিন্তু উদ্যমের অভাবে প্রশ্ন করা হইল না।

কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। মুহূর্ত্ত-কয়েক পরেই দ্বার-প্রান্তে নূতন রেশমের শাড়ীর প্রবল খস্ খস্ শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই কে একজন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল।

অরুণ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল জ্যোৎস্নার আলোকে ইহার পরিধানের রাঙা চেলি চক্‌চক্ করিতেছে। এ যে কে, তাহা চক্ষের নিমিষে উপলব্ধি করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা সেই মুহূর্ত্তেই একেবারে শুকাইয়া উঠিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহারও সময় রহিল না। একটা ভয়ানক মর্ম্মান্তিক চাপা কান্নায় অকস্মাৎ ঘরের বাতাস, ঘরের আঁধার, ঘরের ম্লান আলোক, ঘরের যাহা কিছু সমস্ত একসঙ্গে একমুহূর্ত্তে যেন চিরিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

মিনিট-দুই-তিন হতবুদ্ধির ন্যায় নিঃশব্দে থাকিয়া অরুণ একটু-খানি সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পরিধানের রাঙা চেলির সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার জ্যোৎস্নায় জ্বলিতে লাগিল, সুন্দর ললাটে চন্দ্র-রশ্মি পড়িয়া চন্দনের পত্রলেখা দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারই ঈষৎ

নিম্নে অশ্রুভরা আয়ত চোখ দুটি জল্ জল্ করিতে লাগিল। নারীর এমন রূপ অরুণ আর কখনো দেখে নাই, সে যেন একেবার মুগ্ধ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা কহিল, অরুণদা, আমি পিঁড়ি থেকে পালিয়ে এসেচি তোমাকে নিয়ে যেতে। আজ আমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, মান-অপমানের জ্ঞান নেই—তুমি ছাড়া আজ আমার আমার পৃথিবীতে কেউ নেই—তুমি চল।

কোথায় যাবো?

যেখান থেকে এইমাত্র একজন উঠে গেল—সেই আসনের উপরে।

অরুণ মনে মনে অত্যন্ত আহত হইল। কাণ্ডটা কি ঘটিয়াছে সে বুঝিল। কিছু একটা কলহের পরে বর-পক্ষীয়েরা জোর করিয়া পাত্র তুলিয়া লইয়া গেছে; হিন্দুসমাজে এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে—তাই সেই অপরের পরিত্যক্ত আসনে অকস্মাৎ তাহার ডাক পড়িয়াছে। যেমন করিয়াই হোক, আজ সন্ধ্যার বিবাহ হওয়া চাইই।

কিন্তু নিজে আঘাত খাইলেও অরুণ প্রতিঘাত করিতে পারিল না, বরঞ্চ সস্নেহ ভর্ৎসনার কণ্ঠে কহিল, ছিঃ—তোমার নি
উচিত হয়নি সন্ধ্যা। এমনত প্রায়ই ঘটে—তোমার বাবা কিংবা আর কেউ ত আসতে পারতেন?

বাবা? বাবা ভয়ে কোথায় লুকিয়েচেন। মা পুকুরে ঝাঁপ দিযে পড়েছিলেন, তাঁকে ধরাধরি করে তুলেচে। আমি সেই সময়ে তোমার কাছে ছুটে এসে পড়েচি। উঃ—এতবড় সর্ব্বনাশ কি পৃথিবীতে আর কারো হয়েচে? আমরা বাঁচব কি করে?

তাহার শেষ কথাটায় অরুণ পুনরায় ঘা খাইল। কহিল, কিন্তু আমাকে দিয়ে ত তোমাদের কুল রক্ষা হবে না সন্ধ্যা, আমি যে ভারি

ছোট বামুন। কিন্তু দেশে আরও অনেক কুলীন আছে—তোমার বাবা হয়ত এতক্ষণ সেই সন্ধানেই গেছেন।

সন্ধ্যা কাঁদিয়া বলিল, না, নাঅ রুণদা—বাবা কোথাও যাননি, তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন। আমাকে আর কেউ নেবে না—কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালোবাসো—কেবল তুমিই আমার চিরদিন মান রাখো।

তাহার ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় অরুণ ক্লেশ বোধ করিল, হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেই সন্ধ্যা বাধা দিয়া বলিল, না, আমি উঠবো না—যতক্ষণ পারি পায়ের কাছেই পড়ে থাকব। কুল রক্ষা হবে না বলছিলে? কার কুল অরুণদা? আমি ত বামুনের মেয়ে নই—আমি নাপিতের মেয়ে; তাও ভাল মেয়ে নই। আজ আমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না। উঃ! এতবড় শাস্তি আমাকে তুমি কেন দিলে ভগবান! আমি তোমার কি করেছিলাম!

অরুণ চমকাইয়া উঠিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল বুঝি বা সন্ধ্যা প্রকৃতিস্থা নয়। হয়ত এ-সমস্তই তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের উদ্ভ্রান্ত কল্পনা। হয়ত-বা এ-সকল কিছুই ঘটে নাই, সে পলাইয়া আসিয়াছে—বাড়ীতে তাহার এতক্ষণ হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। তাহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী পাঠাইবার অভিপ্রায়ে সস্নেহে মাথায় হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, চল সন্ধ্যা, তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই।

সন্ধ্যা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, চল। তুমি যে যাবে সে আমি জানতুম; কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনে তবে চল—নইলে কি জানি—তুমিও হয়ত—কি বলেছিলুম তোমাকে একদিন? ছোট বামুন, না? আজ বোধ হয় সেই পাপেই কেবল প্রমাণ হয়ে গেল আমি বামুনের মেয়ে নই। উঃ—আমরা বেঁচে থাকব কি করে অরুণদা?

তাহার মানসিক যাতনার পরিমাণ দেখিয়া অরুণের মন আবার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল হয়ত-বা যথার্থ-ই কি একটা ঘটিয়াছে—হয়ত-বা সে সত্য ঘটনাই বিবৃত করিতেছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কে এ-কথা প্রমাণ করলে?

কে? গোলক চাটুয্যে। হাঁ, সে-ই। কি আমাকে সে বলেছিল জানো? জানো না? আচ্ছা, থাক্ তবে সে-কথা। মা আমাকে সম্প্রদান করতে বসেছিলেন, আমার ঠাকুরমা চুপ করে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। এমনি সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘটক দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হ'লো। একজন তাঁকে ডেকে বললে, তারাদিদি, আমাদের চিনতে পারো? একজন আমার মাকে দেখিয়ে বললে, তুমি ছেলের বিয়ে দিয়ে এই বামুনের মেয়ের জাত মেরেচো—আবার কেন নাতনীর বিয়ে দিয়ে এদের জাত মারচো? তার পরে বাবাকে আঙুল দেখিয়ে সবাইকে ডেকে বললে, তোমরা সবাই শোনো, এই যাকে তোমরা পরম কুলীন প্রিয় মুখুয্যে বলে জানো—সে বামুন নয়; সে হিরু নাপিতের ছেলে।

অরুণ বলিয়া উঠিল, এ-সমস্ত তুমি কি বকে যাচ্ছো সন্ধ্যা?

কিন্তু সন্ধ্যা বোধ করি এ প্রশ্ন শুনিতেই পাইল না—নিজের কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিল, মৃত্যুঞ্জয় ঘটক গঙ্গাজলের ঘটটা ঠাকুরমার সামনে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বলুন সত্যি কি না? বলুন ও কার ছেলে? মুকুন্দ মুখুয্যের, না হিরু নাপিতের? বলুন?······অরুণদা? আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা মাথা হেঁট করে রইলেন, কিছুতেই মিথ্যে বলতে পারলেন না। ওগো! এ সত্যি, এ সত্যি, এ ভয়ঙ্কর সত্যি! সত্যিই আমাদের তোমরা যা বলে জানতে তা আমরা নই। তোমার সন্ধ্যা বামুনের মেয়ে নয়।

অরুণের মনের মধ্যে সংশয়ের আর লেশমাত্র অবকাশ রহিল না, শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, একজন তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললে। সে তাদের গ্রামের লোক। বললে, আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে হয়, তার পরে চোদ্দ-পনর বছর পরে একজন এসে জামাই বলে, মুকুন্দ মুখুয্যে বলে পরিচয় দিয়ে বাড়ী ঢোকে। পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দু'দিন বাস করে চলে যায়।—ওঃ—ভগবান!

অরুণ তেমনি নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, কি বলছিলাম অরুণদা? হাঁ, হাঁ—মনে পড়েচে। তার পর থেকে লোকটা প্রায়ই আসতো। ঠাকুরমা বড় সুন্দরী ছিলেন—আর সে টাকা নিতো না। তার পরে একদিন যখন সে হঠাৎ ধরা পড়ে গেল, তখন বাবা জন্মেচেন। উঃ—আমি, মা হলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম—বড় হতে দিতাম না,—কি বলছিলাম?

অরুণ অস্ফুট-স্বরে বলিল, লোকটা ধরা পড়ে গেল।

সন্ধ্যা বলিল, হাঁ হাঁ, তাই। ধরা পড়ে গেল। তখন সে কি স্বীকার করলে জানো? বললে, এ কুকাজ সে নিজের ইচ্ছেয় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেচে। একে বুড়ো-মানুষ, তাতে পাঁচ-সাত বছর থেকে বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভার তার উপরে দিয়ে বলেছিলেন, হিরু, তুই বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর্, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ্, এখন থেকে যা-কিছু রোজগার করে আনবি তার অর্দ্ধেক ভাগ পাবি।

অরুণ চমকিয়া বলিল, এ-কাজ সে আরও করেছিল নাকি?

সন্ধ্যা কহিল, হাঁ, আরও দশ-বারো জায়গা থেকে সে এমনি করে প্রভুর জন্যে রোজগার করে নিয়ে যেতো। সে আরও কি

বলেছিল জানো? বলেছিল, এ-কাজ নতুনও নয়, আর তার মনিবই কেবল একলা করেন না—এমন অনেক ব্রাহ্মণই দূরাঞ্চলে বখারার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

অরুণ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, খুব সম্ভব সত্যি। নইলে ব্রাহ্মণ-কুলে গোলকের মত কসাই বা জন্মায় কি করে? অথচ এরাই সমস্ত হিন্দু-সমাজের মাথায় বসে আছে। তার পরে?

তার পরে ঠাকুরমা আমার বাবাকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন। সেই অবধি তিনি সন্ন্যাসিনী—সেই অবধি কোথাও মুখ দেখান না।

সন্ধ্যা পুনশ্চ কহিল, হিরু নাকি জিজ্ঞেসা করেছিল, ঠাকুরমশাই, পরকালে কি জবাব দেবো? তার মনিব বলেছিলেন, সে পাপ আমার—আমি তার জবাব দেবো। হিরু জিজ্ঞেসা করেছিল, তাদের গতিই বা কি হবে ঠাকুর?

ঠাকুরমশাই হেসে বলেছিলেন, তারা আমার স্ত্রী, তোর নয়। তোর এত দরদ কিসের? যাদের চোখে দেখিনি, চোখে দেখব না, তাদের গতি কি হবে না হবে সে চিন্তা আমারই বা কি, তোরই বা কি! আমাদের চিন্তা টাকা রোজগার। অরুণদা, তাই সেদিন আমার ঠাকুরমা তোমার কথায় কেঁদে বলেছিলেন, সন্ধ্যা, জাতে কে ছোট, কে বড়, সে কেবল ভগবান জানেন—মানুষ যেন কাউকে কখনো হীন বলে ঘৃণা না করে। কিন্তু তখন ত ভাবিনি তার মানে আজ এমন করে বুঝতে হবে! কিন্তু রাত যে বেশি হয়ে যাচ্ছে—আমাকে নিয়ে তোমাকে কখনো দুঃখ পেতে হবে না অরুণদা, তোমার মহত্ত্ব, তোমার ত্যাগ আমি চিরজীবনে ভুলবো না। বলিয়া সে নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল।

অরুণ অনিশ্চিত-কণ্ঠে সঙ্কোচের সহিত বলিল, কিন্তু এখন ত তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারিনে সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা চকিত হইয়া কহিল, কেন? তুমি সঙ্গে না গেলে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমি বাঁচব কি করে?

এই আকুল প্রশ্নের জবাবটা অরুণ হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না; তার পরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল, আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ভাবতে? এই বলিয়া সন্ধ্যা অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে অরুণের প্রতি চাহিয়া বোধ করি বা অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় তাহার মুখখানাই দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তার পরে একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা ভাবো। একটু নয়, বোধ হয় ভাববার সময় আজীবনই পাবে। এতদিন আমিও ভেবেচি —দিন-রাত ভেবেচি। যখন নিজের কাছে তোমাকে খুব ছোট করে দেখতে আমার বাধেনি, তখন এই কথাই ভেবেচি। আজ আবার তোমাদের ভাববার সময় এলো। আচ্ছা, চললুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার অঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে গিয়া এতক্ষণে তাহার নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ভগবান! এই রাঙা চেলি, এই গায়ের গহনা, এই আমার কপালের কনে-চন্দন—এ-সব পরবার সময়ে এ-কথা কে ভেবেছিল বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া আসিল; সেই ভাঙ্গা-গলায় বলিল, আমি বিদায় হ'লাম অরুণদা। বলিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু দৃষ্টির বাহিরে সন্ধ্যা অন্তর্হিত হইতেই হঠাৎ যেন তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল—ব্যগ্র আকুল-কণ্ঠে চাকরটাকে বার বার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, শিবু, যা যা, সঙ্গে যা! বলিতে বলিতে সে নিজেই ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

বাঁ হাতে প্রদীপ লইয়া প্রিয় মুখুয্যে কি কয়েকটা বস্তু বাক্স হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটুকরা কাপড়ে রাখিতেছিলেন, হঠাৎ পিছনে ডাক শুনিল, বাবা?

কাজটা প্রিয় গোপনেই করিতেছিলেন, শশব্যস্তে হাতের প্রদীপটা রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাড়া দিলেন, কে সন্ধ্যা? এই যে মা, যাই চল্—আর দেরী হবে না—

সন্ধ্যা কষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া কহিল, কি করছিলে বাবা?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, আমি? কই না, কিছুই ত নয় মা।

সেই বস্ত্রখণ্ডটা দেখাইয়া সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, ওতে কি বাবা? কি রাখছিলে?

ধরা পড়িয়া প্রিয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলেন; কতকটা মিনতির সুরে কহিলেন, গোটা-কতক—বেশি নয় মা, রেমিডি সঙ্গে নিচ্ছিলাম—আর ঐ মেটিরিয়া মেডিকাখানা—বড়টা নয়—ছোটটা—ছিঁড়ে-খুঁড়েও গেছে—অচেনা জায়গা—যা হোক একটু প্র্যাক্‌টিস্ করতে হবে ত? তাই ভাবলাম—

মা কি তোমাকে এটুকুও দিতে চায় না বাবা?

প্রিয় অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া কি যে জানাইলেন, ঠিক বুঝা গেল না।

তুমি কোথায় প্র্যাক্‌টিস্ করবে বাবা?

বৃন্দাবনে। সেখানে কত যাত্রী যায়-আসে—তাদের ওষুধ দিলে কি মাসে চার-পাঁচ টাকাও পাবো না সন্ধ্যে? তা হলেই ত আমার বেশ চলে যাবে।

খুব পাব বাবা, তুমি আরও ঢের বেশি পাবে। কিন্তু সেখানে ত তুমি কাউকে জানো না? পরশু শেষ-রাত্রে ঠাকুরমা যখন কাশী চলে গেলেন তুমি কেন তাঁর সঙ্গে গেলে না বাবা?

মার সঙ্গে? কাশীতে? না মা। আর আমি কাউকে জড়াতে চাইনে। আমার জন্যে তোমরা অনেক দুঃখ পেলে, আর আমি কাউকে দুঃখ দেবো না। যতদিন বাঁচব ঐ অচেনা জায়গায় একলাই থাকব।

সন্ধ্যা পিতার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, কিন্তু আমি ত তোমাকে একলা থাকতে দেবে না বাবা, আমি যে তোমার সঙ্গে যাবো।

প্রিয় ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মাথার উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন, দূর্ পাগলি, সে কি হয়? আমার সঙ্গে কোথায় যাবি মা---তোমার মায়ের কাছে তুমি থাকো, সেও অনেক দুঃখ পলে; আর আমার নাম করে যারা ওষুধ চাইতে আসবে তাদের ওষুধ দিয়ো। আর ছাখ্ সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি তোর মা দেয় ত বিপিনটাকে দিয়ে দিস্। সে-বেচারা গরীব, বই কিনতে পারে না বলেই কিছু শিখতে পারে না।

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবোই। এই দেখো না আমার পরণের কাপড়-দুটি আমি গামছায় বেঁধে নিয়েচি; এই বলিয়া সে অঞ্চলের ভিতর হইতে একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া দেখাইল।

প্রিয় কোনদিনই বেশি প্রতিবাদ করিতে পারেন না, তিনি রাজি হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, চল্; কিন্তু তোর মা যে বড্ড দুঃখ পাবে সন্ধ্যা।

কাল সর্বজয়া, সমাজের ষোল-আনার সম্মুখে পিতার উৎকট

দুর্গতি সে চোখে দেখিয়াছে। জগদ্ধাত্রীর নিজের বাড়ী বলিই এতটা সম্ভব হইতে পারিয়াছে—এ অপমান সন্ধ্যার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাহার কোন উল্লেখ করিল না, শুধু বারম্বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, না বাবা, আমি কিছুতেই থাকব না, আমি যাবোই। আমি সঙ্গে না থাকলে কে তোমাকে দেখবে? কে তোমাকে রেঁধে দেবে?

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাবার ঔষধগুলি ও বইগুলি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, চল বাবা আমরা এই বেলা বেরিয়ে পড়ি, নইলে বারোটার ট্রেন হয়ত ধরতে পারা যাবে না।

মায়ের রুদ্ধ ঘরের চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া সন্ধ্যা প্রণাম করিয়া কহিল, মা, আমরা চললুম। কেবল দুখানি পরবার কাপড় ছাড়া আর তোমার আমি কিচ্ছু নিইনি, বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, মা, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার সমস্ত কালি মুখে মেখেই আমরা বিদায় নিলাম—তোমাদের সমাজে এর বিচার হবে না—কিন্তু যাদের মহাপাতকের বোঝা নিয়ে আজ আমাদের যেতে হ'লো, তাদের বিচার করবার জন্যেও অন্ততঃ একজন আছেন, সে কিন্তু একদিন টের পাবে।

ঘরের অভ্যন্তর তেমনি নিস্তব্ধ, দ্বার তেমনি অবরুদ্ধই রহিল। সন্ধ্যা পিতার পিছনে পিছনে বাটীর বাহির হইয়া আসিল। কে একজন অদূরে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, সে কাছে আসিতেই প্রিয় জ্যোৎস্নার আলোকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, কে অরুণ নাকি?

অরুণ কহিল, আজ্ঞে হাঁ। আজ আপনি বাটীর গাড়ীতে যাবেন শুনে দেখতে এলাম।

প্রিয় কহিলেন, হাঁ। আর এই দেখ না মুস্কিল, মেয়েটা কিছুতেই

ছাড়ো মা, সঙ্গ নিলে। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি—দেখ দিকিএর পাগলামি।

অরুণ অবাক্ হইয়া কহিল, সন্ধ্যা, তুমিও যাবে?

সন্ধ্যা শুধু কেবল বলিল, হাঁ।

অরুণ একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া একান্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, সেদিন রাত্রে আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারিনি, কিন্তু আজ নিশ্চয় করচি, তোমার কথাতেই রাজি হব সন্ধ্যা।

প্রিয় বুঝিতে না পারিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা শান্ত-কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেদিন আমিও বড় উতলা হয়ে পড়েছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েচে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কি না, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি। কিন্তু আর ত আমাদের সময় নেই অরুণদা—পারো ত আমাদের ক্ষমা ক'রো। এই বলিয়া সে পিতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িল। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতেই সন্ধ্যা ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, না অরুণদা, আমাদের সঙ্গে আসতে পাবে না, তুমি বাড়ী যাও।

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা, এই দুঃখের সময় তোমার মাকে ছেড়ে চললে?

সন্ধ্যা কহিল, কি করব অরুণদা, এতদিন বাপ মা দু'জনকেই ভোগ করবার সৌভাগ্য ছিল, আজ একজনকে ছাড়তেই হবে। তবু মায়ের বোধ হয় একটা উপায় আছে। কাল অনেকেই ত তামাসা দেখতে এসেছিলেন, কেউ কেউ বলছিলেন, নাকি একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে। থাকো, ভালোই। তখন দেখবার লোকের তাঁর অভাব হবে না, কিন্তু আত্মহারা আমার বাবাকে সামলাবার যে আর কেউ নেই সংসারে। কিন্তু আর দাঁড়িয়ো না বাবা, চল।

এই বলিয়া তাহারা পুনশ্চ অগ্রসর হইয়া গেল, অরুণ সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটুখানি পথ আসিয়া দেখিতে পাইল জন-কয়েক লোক লুচি, মাছের তরকারি ও বিবিধ মিষ্টান্নের ভূয়সী প্রশংসায় সমস্ত রাস্তাটা মুখরিত করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ঘরে চলিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি ধরে না। জ্যোৎস্নার আলোকে পাছে ইহারা চিনিয়া ফেলে এই ভয়ে সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া পথের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারা চলিয়া গেলে আবার পথ চলিতে লাগিল।

মোড় ফিরিয়াই ইহাদের ভূরি-ভোজনের হেতু বুঝা গেল। পার্শ্বের আমবাগানের ভিতর দিয়া গোলক চাটুয্যেমহাশয়ের বাটী হইতে প্রচুর আলোক এবং প্রচুরতর কলরব আসিতেছে। লুচি আনো, তরকারি এইদিকে, দই কে দিচ্ছে, মিষ্টি কই—প্রভৃতি বহু-কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দে সমস্ত স্থানটা জম্ জম্ করিতেছে।

প্রিয় কহিলেন, গোলক চাটুয্যেমশায়ের আজ বৌভাত কিনা! কাজে-কর্ম্মে চাটুয্যেমশাই খাওয়ায় ভাল। শুনলাম একখানা গ্রাম বলা হয়েছে—বামুন শূদ্দুর কেউ বাদ পড়েনি।

সন্ধ্যা অবাক্ হইয়া কহিল, কার বৌভাত বাবা? গোলক ঠাকুর্দ্দার?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ, প্রাণকৃষ্ণের মেয়েটাকে পরশু বিয়ে করলেন কিনা।

সন্ধ্যার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, হরিমতির সঙ্গে তার বৌভাত?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ, হাঁ, হরিমতিই নাম বটে। গরীব বামুন বেঁচে গেল—মেয়েটা বড় হয়ে—কি রে?

কিছু না বাবা, চল, আমরা এখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি যাই।